# গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭১ বর্ষ ৪২ সংখ্যা ৩১ মে - ৬ জুন ২০১৯ প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর www.ganadabi.com আট পাতা মূল্য ঃ ২ টাকা



# বিজেপির নির্বাচনী জয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে দেশব্যাপী শক্তিশালী গণআন্দোলন গড়ে তোলার ডাক দিল এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)

**সাম্প্রতিক লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির বিপুল জয় সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ২৭ মে নিচের বিবৃতি দেন।**

নগ্নভাবে বুর্জোয়া শ্রেণির স্বার্থ রক্ষায় কেন্দ্রের বিজেপি সরকার কর্তৃক গৃহীত একের পর এক চূড়ান্ত জনবিরোধী নীতিতে বিপর্যস্ত দেশের মেহনতি জনগণ ভোট-পূর্ববর্তী সময়ে ক্রোধে ফুঁসছিল এবং এই শ্বাসরোধকারী পরিস্থিতি থেকে মুক্তি চাইছিল। কিন্তু জনজীবনে বিপর্যয় সৃষ্টিকারী এই নীতিগুলিকে নির্বাচনী প্রচারপর্বে অত্যন্ত চাতুর্যের সাথে পিছনে ঠেলে দেওয়া হল। এ শুধু আরএসএস-বিজেপি করল তাই নয়, অন্যান্য ভোটসর্বস্ব বুর্জোয়া দলগুলি তো বটেই, এমনকী সিপিএম-সিপিআইয়ের নির্বাচনী প্রচারেও এগুলি গুরুত্ব পেল না। উল্টে কিছু তৈরি করা ইস্যু অত্যন্ত ধূর্ততার সাথে সামনে নিয়ে আসা হল জনগণের দৃষ্টি ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য। ধর্মীয় উগ্রতা, জাতিদম্ভ, যুদ্ধ-উত্তেজনা, সাম্প্রদায়িক জাতপাতগত মেরুকরণ প্রভৃতিতে জোরালো ভাবে মদত দেওয়া হল। শাসক বুর্জোয়া শ্রেণির আশীর্বাদধন্য হয়ে অর্থবল-পেশিবল-প্রচারমাধ্যম ও প্রশাসনিক ক্ষমতাকে যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করে অত্যন্ত ধূর্ততার সাথে নির্বাচনী ফলাফলকে কারচুপির দ্বারা বিজেপির পক্ষে নিয়ে আসা হল, যা সম্পূর্ণই জনগণের ইচ্ছা ও স্বার্থের বিরোধী। নানা সময়ে আমরা একাধিকবার বলে এসেছি যে, আজকের দিনে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের কণামাত্র নেই। তাকে সম্পূর্ণ ভাবেই প্রহসনে পরিণত করা হয়েছে। এবারের লোকসভা নির্বাচনে যেভাবে আরএসএস-বিজেপি জঘন্য ধরনের ষড়যন্ত্র, প্রতারণা, অসততা এবং ভণ্ডামিকে আশ্রয় করল, তা আমাদের উপরোক্ত বক্তব্যকে সন্দেহাতীত সত্য বলে প্রমাণ করেছে। অন্য আরেকটি প্রাসঙ্গিক লক্ষণীয় বিষয় হল, সমস্ত রকমের গণতান্ত্রিক ন্যায়নীতিকে লংঘন করে নির্বাচন কমিশন নিরপেক্ষ থাকার ভান দেখিয়ে বাস্তবে শাসক বিজেপির নির্বাচনী স্বার্থরক্ষায় বেপরোয়া ভূমিকা নিয়েছে।

*আটের পাতায় দেখুন*

*গুজরাটের সুরাটে কোচিং সেন্টারে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ২১ জন ছাত্র-ছাত্রীর মর্মান্তিক মৃত্যুতে শোকবেদি স্থাপন ও দোষীদের শাস্তির দাবি এস ইউ সি আই (সি)-র । আমেদাবাদ, ২৫ মে*

# দিশাহীন হয়েই সিপিএম নেতা-কর্মীরা বিজেপির পক্ষে দাঁড়ালেন

সিপিএম কর্মী-সমর্থকরা বামপন্থী হয়েও কেন ও কীভাবে বিজেপির পক্ষে দাঁড়ালেন, রাজ্য-রাজনীতিতে আজ এটা বিরাট প্রশ্ন। আরএসএস-বিজেপি আদর্শগত ভাবেই বামপন্থাকে তাদের প্রধান শত্রু বলে মনে করে। সেই আরএসএস-বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই গড়ে তুলতে বামপন্থী আদর্শকে শক্তিশালী করা দরকার, বামপন্থার শক্তি বাড়ানো দরকার। সেই লক্ষ্য থেকেই আমরা এই সমীক্ষায় জোর দিচ্ছি। সিপিএম কর্মী-সমর্থকদের কাছে আবেদন, বিদ্বেষমুক্ত মন নিয়ে আমাদের কথাগুলো বিচার করবেন।

এ রাজ্যে বিজেপির অস্তিত্ব প্রায় ছিলই না। তা সত্ত্বেও যে তারা এই নির্বাচনে উল্কাগতিতে সামনে চলে এল, এর পিছনে শাসক তৃণমূলের অপশাসনের বিরুদ্ধে মানুষের ক্ষোভ গুরুত্বপূর্ণ কারণ হিসাবে কাজ করেছে সন্দেহ নেই। মানুষ তৃণমূলের চুরি-দুর্নীতি-ঔদ্ধত্য, আর ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতির বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছে। কিন্তু শুধু তাতেই বিজেপি এই সাফল্য পেত না। সিপিএমের ভোট যে ব্যাপকভাবে বিজেপিতে গিয়েছে সেটি এখন আর কোনও অনুমান বা গোপন বিষয় নয়। একদিকে যেমন ভোটের শতকরা হিসেবে তা স্পষ্ট, তেমনই সিপিএম নেতারাও তা স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছেন। মাত্র তিন বছর আগের বিধানসভা নির্বাচনের সঙ্গে তুলনা করলেও সিপিএম ফ্রন্টের ভোট ২৬ শতাংশ থেকে কমে ৭.২ শতাংশে পৌঁছেছে। কিন্তু তার থেকেও অনেক বেশি উদ্বেগের বিষয় হল, বিজেপির জয়ে সিপিএম কর্মী-সমর্থকদের উল্লাস, যা তারা কিছুতেই চেপে রাখতে পারেননি।

এখন এই যে সিপিএম কর্মী-সমর্থকরা দলে দলে বিজেপিকে ভোট দিলেন, এটা কি তাঁদের নিজস্ব সিদ্ধান্ত? যদি তাই হয় তা হলে দার্জিলিং থেকে সুন্দরবন পর্যন্ত একই সুর শোনা গেল কী করে? তা হলে নেতৃত্ব কি বলে দিয়েছিলেন? ভোটের একদম শেষ পর্বে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের যে বিবৃতি কাগজে প্রকাশ করা হল, তাতে বোঝানো হল, নেতৃত্ব এই প্রবণতা চান না। যদি তাই হয় তবে তাঁরা আগে বলেননি কেন? এ নিয়ে অনেক অনুমান ও প্রশ্ন রাজনৈতিক মহলে ঘুরছে। আমরা সে কথায় যাব না।

আসলে একটু পিছিয়ে তাকালে দেখব, ২০১১ সালের নির্বাচনে সিপিএম ফ্রন্টের পরাজয়, যার পিছনে সিপিএম কর্মীদের ভূমিকা কম ছিল না। না হলে যাদবপুরের মতো সিপিএম গড়ে এক মামুলি আমলার কাছে ১৬ হাজার ভোটে মুখ্যমন্ত্রীর পরাজয় ঘটল কী করে? আসলে সিপিএমের ঔদ্ধত্য, দুর্নীতি দলবাজি তোলাবাজি ইত্যাদির বিরুদ্ধে সিপিএমের মধ্যেই প্রবল অসন্তোষ দানা বেঁধেছিল। তার থেকেই একটা বড় অংশ চেয়েছিলেন ভোটে নেতৃত্বকে কিছুটা শিক্ষা দিতে। কিন্তু মুশকিল হল, নেতৃত্ব যে এই শিক্ষা নিলেন না, আত্মসমীক্ষা দলে হল না— এই দিকটা বিক্ষুব্ধ কর্মীরা বিচার করে দেখলেন না। পরাজয়ের পর প্রথম দিকে খানিকটা নিজেদের ত্রুটি-গলদের কথা বললেও নেতৃত্ব তৃণমূল সরকার বিরোধী হুঙ্কার দিয়ে আত্মসমীক্ষার জরুরি বিষয়কে চাপা দিলেন এবং বলতে লাগলেন ২০১৬-র বিধানসভা নির্বাচনে সিপিএম আবার ক্ষমতায় ফিরে আসবে। এই আশায় ও মোহে সিপিএমের কর্মী বাহিনী বুঁদ হয়ে গেলেন আবার। কিন্তু কংগ্রেসের সঙ্গে জোট করেও সেই

**তার থেকেও অনেক বেশি উদ্বেগের বিষয় হল, বিজেপির জয়ে সিপিএম কর্মী-সমর্থকদের উল্লাস, যা তারা কিছুতেই চেপে রাখতে পারেননি।**

*দুয়ের পাতায় দেখুন*

# দিশাহীন হয়েই সিপিএম নেতা-কর্মীরা বিজেপির পক্ষে দাঁড়ালেন

*একের পাতার পর*

আশা ফলপ্রসূ হল না। বরং তৃণমূল কংগ্রেস আগের থেকেও বেশি আসনে জয়ী হয়ে গেল। কেন এটা ঘটল সেটাও অসন্তুষ্ট কর্মীরা বিচার-বিবেচনা করলেন না। তাঁরা বুঝতেই চাইলেন না, তাঁদের চৌত্রিশ বছরের শাসনকে মানুষ ভুলতে পারছে না। এখনও মানুষ সিপিএমকে চাইছে না। এই অবস্থায় অসন্তুষ্ট নেতা-কর্মীদের উচিত ছিল আত্মসমীক্ষা করার জন্য নেতৃত্বের উপর চাপ সৃষ্টি করা। জনগণের কাছে ভুল স্বীকার করতে নেতৃত্বকে বাধ্য করা। কিন্তু সে পথে না গিয়ে তাঁরা আওয়াজ তুললেন, সিঙ্গুরে টাটাকে না আসতে দিয়েই পশ্চিমবঙ্গের শিল্পবিকাশের সম্ভাবনাকে ধ্বংস করা হয়েছে। অর্থাৎ সিপিএম সরকার সর্ববিষয়ে ঠিক ছিল, সেই সিপিএমকে সরকার থেকে সরিয়ে জনগণ ভুল করেছে। ক্রমে ক্রমে এই ভ্রান্ত চিন্তা ছড়িয়েছে, দৃঢ়মূল হয়ে বসেছে। অন্য দিকে তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে আন্দোলন করার বা উঠে দাঁড়ানোর নৈতিক শক্তি চৌত্রিশ বছর সরকারি ক্ষমতা ভোগ করার সুবাদে সমগ্র পার্টিটাই হারিয়ে বসেছে। এই অবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারি ক্ষমতা ও টাকার জোর নিয়ে বিজেপি যখন এ রাজ্যে নামল, সিপিএম কর্মীরা অদ্ভুত রসায়নে ধরে নিলেন, তাঁদের দল নয়, কেন্দ্রীয় সরকারের জোরে বিজেপিই পারবে তৃণমূলকে উৎখাত করতে। এই সময় সিপিএম নেতৃত্বের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একটি বামপন্থী দলের কর্মীদের এ ধরনের চিন্তা যে ভুল ও বিধ্বংসী সে কথাটা নানা ভাবে দলের মধ্যে প্রচার ও শিক্ষার দ্বারা নিয়ে যাওয়াই ছিল নেতৃত্বের দায়িত্ব ও কর্তব্য। বিজেপির পুঁজিবাদ তোষণকারী, হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির প্রভাব যে দেশে বাড়ছে, পশ্চিমবঙ্গেও সাম্প্রদায়িক রাজনীতির চোরা স্রোত তারা বইয়ে দিচ্ছে, এটা পরিষ্কার বোঝা গেলেও সিপিএম নেতৃত্ব ভয়ঙ্কর শক্তি বিজেপিকে টার্গেট করলেন না। টার্গেট হিসেবে রাখলেন রাজ্যের সরকারকেই। সঙ্গে, বলতে হয় তাই বলার মতো বিজেপির বিরুদ্ধেও কিছু কথা বলতে থাকলেন। ফলে নেতা-কর্মীরা দিশাহীন হয়ে পড়লেন।

> **দল মানেই কোনও না কোনও শ্রেণির দল একথা ঠিক, তেমনই আলাদা আলাদা দল মানেই আলাদা আলাদা চিন্তাপ্রক্রিয়া। একই কমিউনিস্ট আন্দোলনের শরিক হয়েও লেনিন-স্ট্যালিনের চিন্তাপ্রক্রিয়া আর ট্রটস্কি-বুখারিনদের চিন্তাপ্রক্রিয়া এক ছিল না। তাই লেনিন-স্ট্যালিনরা সমাজতন্ত্র গড়লেন আর ট্রটস্কি সাম্যবাদের জয়ধ্বনি করতে করতে সমাজতন্ত্রকে ধ্বংস করার যজ্ঞে নামলেন। চীনে মাও সে তুঙের চিন্তাপ্রক্রিয়া আর লিউ সাউ চি-তেং শিয়াও পিং দের চিন্তাপ্রক্রিয়া এক ছিল না। তাই মাও সে তুঙ সমাজতন্ত্র গড়েছেন, লিউ সাউ চি তেং শিয়াও পিংরা তাকে পুঁজিবাদের দিকে নিয়ে যেতে চেয়েছেন।**

দেশের পরিস্থিতি, সমস্যা, সংকট এক রকম থাকে না। আজ, সমাজতান্ত্রিক শিবিরের পতনের পর বিশ্ব জুড়ে দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়ার ঝড় চলছে। দেশে দেশে দক্ষিণপন্থী ফ্যাসিস্ট শক্তিরা আবার মাথা তুলছে। শুধুমাত্র লিবারেল ডেমোক্রেসির স্লোগান তুলে একে রোখা যাচ্ছে না। মার্কসবাদের কথা বাদই দিলাম, বামপন্থার আদর্শকে শক্তিশালী করতে না পারলে বামপন্থী কর্মীদের আদর্শগত চেতনা জীবন্ত রাখতে না পারলে, সমস্ত রকম প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তার বিরুদ্ধে আদর্শগত সংগ্রাম গড়ে তুলতে না পারলে, এবং সর্বোপরি মানুষের জীবনের সমস্যাগুলি নিয়ে বামগণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তুলতে না পারলে দক্ষিণপন্থার আক্রমণকে প্রতিহত করা যাবে না, এমনকী বামপন্থী কর্মীদেরও রক্ষা করা যাবে না, এই গুরুতর ও গভীর চিন্তার কোনও লক্ষণ সিপিএম নেতৃত্বের মধ্যে দেখা যায়নি। তাঁরা বরাবরই মনে করেছেন, যেখানে যার সঙ্গে সম্ভব জোট করে নির্বাচনে জয়ী হতে পারলেই তাঁদের দল বাঁচবে ও তাঁদের বামপন্থা রক্ষা পাবে। ত্রিপুরায় সিপিএমের পরাজয় ও তারপর বিজেপির তাণ্ডব দেখেও পশ্চিমবঙ্গে তাঁরা কার্যত নিষ্ক্রিয় রইলেন। সমগ্র দলের নেতা-কর্মীদের জড়িত করে বিজেপি-আরএসএসের বিরুদ্ধে যে আদর্শগত সংগ্রামের স্রোত দলের মধ্যে বইয়ে দেওয়া দরকার ছিল, তা তাঁরা করলেন না। তাঁদের সমস্ত আদর্শ-হিসেবনিকেশের কেন্দ্রে একটিই কথা— ভোট। ফলে সিপিএমের যে বিরাট কর্মী-সমর্থক বাহিনী আজও আছে, নেতৃত্ব তাঁদের কোনও বামপন্থী দিশা দেখাতে পারলেন না। তৃণমূল হঠাও বাংলা বাঁচাও— এই ধরনের একটা সস্তা স্লোগান কর্মীদের মুখে মুখে ঘুরতে লাগল। কিন্তু 'বিজেপি হঠাও দেশ বাঁচাও', এই বিষয়টা চলে গেল পিছনে। নেতা-কর্মীরা এতটাই দিশাহীন হয়ে পড়লেন যে মিডিয়ায় যখন প্রকাশিত হল, জেলায় জেলায় দলে দলে কর্মীরা বিজেপির পক্ষপুটে আশ্রয় নিচ্ছে, তখন সেই ঝোঁক আটকানোর পরিবর্তে নেতারা বলতে থাকলেন, বাঁচার আশায় কর্মীরা বিজেপিতে শেল্টার নিচ্ছে। ফলে বিজেপিতে যাওয়ার যে ভ্রান্ত এবং বিধ্বংসী প্রবণতা, সেটাই মদত পেয়ে গেল। যার বিকট ফলাফল দেখা গেল এবারের নির্বাচনে।

কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা থেকে আমরা জানি, দল মানে একটা চিন্তাপ্রক্রিয়া। দল মানেই কোনও না কোনও শ্রেণির দল একথা ঠিক, তেমনই আলাদা আলাদা দল মানেই আলাদা আলাদা চিন্তাপ্রক্রিয়া। একই কমিউনিস্ট আন্দোলনের শরিক হয়েও লেনিন-স্ট্যালিনের চিন্তাপ্রক্রিয়া আর ট্রটস্কি-বুখারিনদের চিন্তাপ্রক্রিয়া এক ছিল না। তাই লেনিন-স্ট্যালিনরা সমাজতন্ত্র গড়লেন আর ট্রটস্কি সাম্যবাদের জয়ধ্বনি করতে করতে সমাজতন্ত্রকে ধ্বংস করার যজ্ঞে নামলেন। চীনে মাও সে তুঙের চিন্তাপ্রক্রিয়া আর লিউ সাউ চি-তেং শিয়াও পিং দের চিন্তাপ্রক্রিয়া এক ছিল না। তাই মাও সে তুঙ সমাজতন্ত্র গড়েছেন, লিউ সাউ চি তেং শিয়াও পিংরা তাকে পুঁজিবাদের দিকে নিয়ে যেতে চেয়েছেন। আজ যে চীন কমিউনিস্ট পার্টির সাইনবোর্ড লাগিয়ে দেশটাকে একটা ফ্যাসিস্ট পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে পরিণত করল, সেটাও কি সবাই ধরতে পারছে। অর্থনৈতিক সাময়িক অগ্রগতির ঝলক দেখিয়ে বিশ্বের কত কমিউনিস্ট মনোভাবাপন্নদের চীন ঘোল খাইয়ে দিয়েছে। আজও কত জন মনে করেন, লেনিন-স্ট্যালিনরা নয়, ট্রটস্কি-বুখারিনরাই ঠিক ছিলেন। সিপিএমের কর্মী-সমর্থকদেরও তাই বলব, বামপন্থার নামে ভ্রান্ত চিন্তাই আপনাদের এই বিধ্বংসী পথে নিয়ে গেল এবং এটা ঘটল মার্কসবাদী বলে নিজেদের দাবি করেও বামপন্থী চিন্তাপ্রক্রিয়া নেতৃত্বের নেই বলে। কেউ সিপিএম নেতৃত্বকে বলেনি, সুপরামর্শ দেয়নি এটাও সত্য নয়। বিশাখাপত্তনমে সিপিএমের বাইশতম কংগ্রেসে আমন্ত্রিত হয়ে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ এক দুই তিন চার করে বামপন্থীদের কর্তব্য-কর্মের কথা বলে এসেছিলেন। শোনার মন থাকলে তাঁরা সেগুলি বিচার করে দেখতেন। কিন্তু যে ভ্রান্ত চিন্তাপ্রক্রিয়ার ফাঁদে তাঁরা নিজেদের জড়িয়েছেন সেখান থেকে বেরোনো বড় মুশকিল।

সিপিএমের নেতা-কর্মীদের মধ্যে যাঁরা আজও বামপন্থার প্রতি শ্রদ্ধাশীল তাঁদের বলব, সিপিএমের ভ্রান্ত চিন্তাপ্রক্রিয়া থেকে নিজেদের বের করতে না পারলে নিজেদের জীবনেও বামপন্থী আদর্শকে রক্ষা করতে পারবেন না, সমাজজীবনেও তাকে প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন না।

## জীবনাবসান

দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার সোনারপুর থানার রাজপুর এলাকায় দলের প্রবীণ কর্মী কমরেড নৃপেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ১৯ মে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর।

স্কুলের ছাত্রাবস্থাতেই ১৯৫০ সাল নাগাদ তিনি দলের সঙ্গে যুক্ত হন। প্রথম সাধারণ নির্বাচনে যে গুটিকয়েক ছাত্র-কর্মীকে নিয়ে প্রয়াত নেতা কমরেড সুবোধ ব্যানার্জী জয়নগরের দক্ষিণ বারাসত এলাকায় দলের কাজ শুরু করেন কমরেড নৃপেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ছিলেন তাদের অন্যতম। কলকাতার সুরেন্দ্রনাথ কলেজে পড়ার সময় কংগ্রেসের প্রবল সন্ত্রাসের মধ্যেও ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি নির্বাচিত হন।

পরবর্তীকালে লাঙ্গলবেড়িয়া এলাকায় শিক্ষকতা করার সময় ওই এলাকায় তিনি দলের কাজ শুরু করেন। একসময় রেলে চাকরি নিলেও দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে চাকরি ছাড়েন ও শিক্ষকতার পেশাকেই বেছে নেন। এই সময় কলকাতায় গৌখানা ঝাড়ুদার ইউনিয়নের কাজ শুরু করেন। মাধ্যমিক শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সমিতি গঠনের সময় থেকেই তিনি এই সংগঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন। শিক্ষকদের অধিকার সংক্রান্ত নানা আন্দোলন, অবসরের বয়স নিয়ে আন্দোলনের পাশাপাশি প্রথমিকে ইংরেজি ও পাশ-ফেল পুনঃপ্রবর্তনের আন্দোলনে শিক্ষকদের যুক্ত করার কাজে তিনি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেন। চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের পর দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলায় তিনি বিদ্যুৎ গ্রাহক আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা নেন। তিনি বিদ্যুৎ গ্রাহক সংগঠনের জেলা সম্পাদকের দায়িত্বও পালন করেছেন।

পরিবারের মধ্যে এবং সমান্য পরিচিত থেকে শুরু করে আত্মীয়-স্বজনের কাছে সর্বদাই নীতি-আদর্শ নিয়ে আলোচনা করতেন। আদর্শবাদী এই মানুষটি নিষ্ক্রিয় থাকতে পারতেন না, জীবনের একেবারে শেষ কয়েকটি বছর দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ঘরবন্দি হয়ে গেলেও দলের সমস্ত বিষয়ের খোঁজ খবর রাখতেন। দলের বই পত্র-পত্রিকা পড়ে শোনানোর জন্য পরিচিতদের অনুরোধ করতেন।

তাঁর মৃত্যুতে শিক্ষক আন্দোলন এবং বিদ্যুৎ গ্রাহক আন্দোলন একজন উদ্যোগী সংগঠককে হারাল, দল হারাল একজন একনিষ্ঠ প্রবীণ কর্মীকে।

**কমরেড নৃপেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী লাল সেলাম**

## জলপাইগুড়িতে বিক্ষোভ

*মদ, গাঁজা সহ মাদকদ্রব্যের প্রসার, নারী নির্যাতন এবং ইভটিজিং রুখতে অবিলম্বে প্রশাসনকে কড়া পদক্ষেপ নেওয়ার দাবিতে জলপাইগুড়ি শহরের 'উত্তর সুকান্তনগর মদ ও গাঁজা বিরোধী মহিলা কমিটি'-র পক্ষ থেকে ২১ মে আবগারি দপ্তরে বিক্ষোভ দেখানো ও ডেপুটেশন দেওয়া হয়।*

# গোমূত্রে ক্যান্সার সারে? সত্যি?

২০১৪ সালে বিজেপি সরকার কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন হওয়ার পর দলের নেতারা ও তাদের মেন্টর আর এস এস হিন্দুত্ববাদী অ্যাজেন্ডা রূপায়ণের জন্য নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। এ জন্য, তারা ইতিহাস বিকৃত করছে, স্কুলের সিলেবাসে নানা অবৈজ্ঞানিক ও অনৈতিহাসিক তথ্য অন্তর্ভুক্ত করছে, ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের মতো ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানকে অপবিজ্ঞান প্রচারের কাজে লাগাচ্ছে। ভোপাল কেন্দ্রের বিজেপি সাংসদ প্রজ্ঞা সিং ঠাকুর সাম্প্রতিক লোকসভা নির্বাচনের প্রচারে দাবি করেছিলেন, গোমূত্র ও পঞ্চগব্য খেয়ে তাঁর ক্যান্সার সেরে গেছে। কিন্তু তাঁর ক্যান্সার সারার কারণ অস্ত্রোপচার করে দু'টি স্তন কেটে বাদ দেওয়া, সে-কথা তিনি সচেতনভাবে গোপন করে গেছেন যাতে গোমূত্রের উপকারিতা প্রচার করা যায়। লখনউয়ের রামমনোহর লোহিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সের ডাঃ এস এস রাজপুত বলেছেন, 'আমি তিনবার তাঁর স্তনে অস্ত্রোপচার করে ক্যান্সার আক্রান্ত স্থান কেটে ফেলে দিই।' প্রথম অস্ত্রোপচার করা হয় মুম্বইয়ের জে জে হাসপাতালে যখন তাঁর ডান স্তনে একটি টিউমার হয়। ২০১২ সালে আবার টিউমার হওয়ায় ভোপালের একটি বেসরকারি হাসপাতালে দ্বিতীয়বার অস্ত্রোপচার করে টিউমার আক্রান্ত তাঁর ডান স্তনের এক-তৃতীয়াংশ বাদ দেওয়া হয়। ২০১৭ সালে লখনউয়ে তাঁর হাসপাতালে তৃতীয়বার অস্ত্রোপচার করে ঠাকুরের (প্রজ্ঞা সিং) দু'টি স্তনই কেটে বাদ দেওয়া হয়। ফলে, তাঁর ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা প্রায় নেই। ডাঃ রাজপুতের কথা থেকে এটা স্পষ্ট যে, ঠাকুরের দাবির সত্যতা নেই, হিন্দুত্ববাদী অ্যাজেন্ডার প্রচারই ওই মিথ্যাচারের উদ্দেশ্য।

দেশের প্রতিষ্ঠিত ক্যান্সার বিশেষজ্ঞরা বলেছেন যে, ক্যান্সারের চিকিৎসায় গোমূত্রের কোনও উপযোগিতা নেই। যেমন, অন্যতম প্রবীণ অঙ্কোসার্জন টাটা মেমোরিয়াল সেন্টারের ডিরেক্টর ডাঃ রাজেন্দ্র বাদোয়ে বলেছেন, গোমূত্র বা ওই ধরনের কোনও ক্যান্সারের চিকিৎসায় বিন্দুমাত্র উপযোগিতার কোনও প্রমাণ কোনও গবেষণায় পাওয়া যায়নি। বিশ্বে কেবলমাত্র রেডিওথেরাপি, কেমোথেরাপি এবং বর্তমানে ইমিউনোথেরাপি স্তন ক্যান্সারের বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসার স্বীকৃত পদ্ধতি। এই ধরনের দাবি মানুষকে ভুল পথে চালিত করবে। ওই সেন্টারের ডেপুটি ডিরেক্টর প্রবীণ ক্যান্সার সার্জন ডাঃ পঙ্কজ চতুর্বেদীও বলেছেন, এই ধরনের দাবি ক্যান্সারের রোগীদের ভুল পথে চালিত করবে। ওই সেন্টারের অ্যাকাডেমিক ডিরেক্টর ডাঃ শ্রীপদ বনভলি বলেছেন, স্তন ও ব্লাড ক্যান্সার বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসায় নিরাময় করা যায়। তিনি প্রশ্ন করেন, কেউ যদি দাবি করেন, গোমূত্র ক্যান্সার নিরাময় করে তা হলে তিনি কি কোনও গবেষণায় তা প্রমাণ করতে পারবেন? প্রিন্স অ্যালি খান ও ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালের প্রখ্যাত ক্যান্সার সার্জন ডাঃ সুলতান প্রধান বলেছেন, ঠাকুরের দাবি আদৌ সমর্থনযোগ্য নয়।

হিন্দুত্ববাদীরা 'গোমূত্র পানের নানা উপযোগিতা আছে' বলে দাবি করে। প্রশ্ন হল, দেশের চিকিৎসা ব্যবস্থা কি পরীক্ষিত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি দ্বারা পরিচালিত হবে, নাকি পৌরাণিক ধারণার দ্বারা পরিচালিত হবে? কোনও জিনিস খাওয়ার আগে, বিশেষত যদি তা ওষুধ হয়, ভালভাবে পরীক্ষা করে দেখা দরকার মানুষের ক্ষেত্রে তার উপযোগিতা আছে কি না এবং তা ক্ষতিকর কি না। গোমূত্রের ক্ষেত্রে এর কোনও উপকারিতা প্রমাণিত হয়নি। বরং কয়েকটি গবেষণায় দেখা গেছে গোমূত্র পান করায় বিষক্রিয়া, গুরুতর সংক্রমণ ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্যা হতে পারে। সহজ যুক্তিতেই বোঝা যায়, গোমূত্রের সঙ্গে মানুষের মূত্রের মূলগত কোনও পার্থক্য নেই। আমরা যে খাদ্য গ্রহণ করি তার কিছুটা হজম হয় এবং ক্ষতিকর ও অপ্রয়োজনীয় অংশগুলি গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টিনাল ট্র্যাক্ট-এর মাধ্যমে শরীর থেকে নির্গত হয়। বিপাক ক্রিয়ার সময় উৎপন্ন বর্জ্য পদার্থগুলি কিডনির ছাঁকনির মাধ্যমে মূত্ররূপে শরীর থেকে বেরিয়ে যায়। অধিকাংশ স্তন্যপায়ীদের ক্ষেত্রে একই ঘটনা ঘটে। তাই গোমূত্রের রাসায়নিক উপাদানগুলি মূলত একই এবং এ কথার কোনও যুক্তি নেই যে গোমূত্র পানের উপকারিতা আছে। পশুপালন, ডেয়ারি ও মৎস্য মন্ত্রক এবং ২০১৬ সালে ভারতীয় কৃষি গবেষণা পরিষদের মতো দেশের ১৪টি ভেটেরিনারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে প্রথম স্থানাধিকারী লুধিয়ানার গুরু অঙ্গদ দেব ভেটেরিনারি এবং পশু বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের ২২টি বিভাগও গোমূত্রের কোনও উপকারিতা খুঁজে পায়নি। স্পষ্টতই, গোমূত্র ও পঞ্চগব্যের উপকারিতা নিয়ে সঙ্ঘ পরিবার যে প্রচার করছে তার পিছনে রয়েছে অন্ধবিশ্বাস, তার কোনও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। এটি দেশকে মধ্য যুগে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়।

তবে সঙ্ঘ পরিবারের ভাবনায় প্রভাবিত গুজরাটের জুনাগড় কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনজন বিজ্ঞানী দাবি করেছেন, তাঁরা গোমূত্রের সাহায্যে ক্যান্সার কোষকে মেরে ফেলতে সক্ষম হয়েছেন। কিন্তু তাঁরা যে সঠিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন, তার কোনও প্রমাণ নেই। তবুও কেন্দ্রীয় সরকারের আয়ুষ মন্ত্রক চিকিৎসার ক্ষেত্রে গোমূত্র ব্যবহারের ওপর গুরুত্ব দিচ্ছে। পিটিআই-এর রিপোর্ট অনুযায়ী ২০১৬ সালের ২৫ নভেম্বর কেন্দ্রীয় আয়ুষ মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীপদ নায়েক বলেন, নাগপুরের গো-বিজ্ঞান অনুসন্ধান কেন্দ্রের সঙ্গে যৌথভাবে কাউন্সিল অফ সায়েন্টিফিক অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ (সিআইআইআর) তার অধীনস্থ পরীক্ষাগারগুলিতে গোমূত্রের অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ধর্ম এবং অসংক্রমণ ধর্ম ও ক্যান্সার চিকিৎসা নিয়ে গবেষণা করছে। ২০১৭ সাল থেকে গো-বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণাকে মৌলিক গবেষণার থেকেও জাতীয় ক্ষেত্রে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। ওই বছর ২৫ এপ্রিল দিল্লি আইআইটির সঙ্গে যৌথভাবে ডিপার্টমেন্ট অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি (ডিএসটি), ডিপার্টমেন্ট অফ বায়োটেকনোলজি (ডিবিটি) এবং সি এস আই আর সায়েন্সিটিফিক 'ভ্যালিডেশন অ্যান্ড রিসার্চ অন পঞ্চগব্য' (সায়েন্টিফিক ভ্যালিডেশন অ্যান্ড রিসার্চ অন পঞ্চগব্য বা এসভিএআরওপি) নামক একটি জাতীয় কর্মসূচি গ্রহণ করে। পঞ্চগব্যের নানা উপকারিতা হবে গবেষণার বিষয়। এ জন্য ১৯ জন সদস্য নিয়ে একটি জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই কমিটির চেয়ারম্যান কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও ভূবিজ্ঞান বিভাগের মন্ত্রী হর্ষবর্ধন। এর কো-চেয়ারম্যান বিজয় পি ভাটকর, যিনি নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য এবং আরএসএসের সঙ্গে যুক্ত একটি এনজিও বিজ্ঞান ভারতী, যা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে হিন্দুত্ববাদী অ্যাজেন্ডা রূপায়ণ করতে সচেষ্ট, তার জাতীয় সভাপতি। অন্য সদস্যরা হলেন সিএসআইআর-এর প্রাক্তন ডিরেক্টর জেনারেল আর এ মাসেলকর, ডিএসটি, ডিবিটি, নতুন এবং পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি মন্ত্রকের সেক্রেটারিরা, দিল্লি আইআইটির ডিরেক্টর, বিজ্ঞান ভারতীর সম্পাদক এ জয়কুমার, নাগপুরের গো-বিজ্ঞান অনুসন্ধান কেন্দ্রের সুনীল মান সিংহ, সিএসআইআর, ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ এগ্রিকালচারাল রিসার্চ, ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ এবং সেন্ট্রাল কাউন্সিল ফর রিসার্চ ইন আয়ুর্বেদিক সায়েন্সেস-এর ডিরেক্টর জেনারেল প্রমুখ। গো-চিকিৎসা নিয়ে গবেষণার প্রধান চালিকা শক্তি হল দিল্লি আইআইটি, যেখানে দীর্ঘদিন ধরে হিন্দুত্ববাদের চর্চা চলছে। ১৯৯২ সালে বাবরি মসজিদ ধ্বংসের পর সেখানে লাড্ডু বিতরণ করা হয়েছিল।

গোমূত্র ও পঞ্চগব্যকে রোগ নিরাময়ে ব্যবহার করার জন্য আয়ুষ মন্ত্রক যথেষ্ট গুরুত্ব দিলেও এই সংক্রান্ত গবেষণা যথাযথভাবে প্রকাশ করা হচ্ছে না। পরিবর্তে বলা হচ্ছে এই বিষয়ে পেটেন্ট নেওয়া হয়েছে। কিন্তু কোনও কিছুর পেটেন্ট নেওয়ার অর্থ এই নয় যে তা মানবজাতির পক্ষে উপকারী। বিজ্ঞানসম্মতভাবে তা প্রমাণ করা দরকার। এই কাজটিকে আয়ুষ মন্ত্রক উপেক্ষা করছে। বোটানিক্যাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট ও সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউট ফর মেডিসিন্যাল অ্যান্ড অ্যারোমেটিক প্ল্যান্টস-এর সঙ্গে যৌথভাবে ডায়াবেটিসের একটি ওষুধ বিজিআর-৩৪ উদ্ভাবন করেছে। দাবি করা হচ্ছে, এটি রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে এবং বিপাক ক্রিয়া বৃদ্ধি করে। এই ওষুধটির বাণিজ্যিক উৎপাদক ও পরিবেশক এআইএমআইএল ফারমাসিউটিক্যাল-এর একজন কার্যনির্বাহী সঞ্চিত শর্মা বলেছেন, এটি 'বৈজ্ঞানিকভাবে পরীক্ষিত'এবং 'অ্যালোপ্যাথিক মান' পূরণ করে। সিএসআইআর অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর এস কে রাওয়াত বলেছেন, এআইএমআইএল এই ওষুধটির ক্লিনিক্যাল পরীক্ষা করেছে এবং এর সাফল্যের হার ৬৭ শতাংশ। কিন্তু ভারতের ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল রেজিস্ট্রি, যারা ভারতের সমস্ত ওষুধের ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল রেকর্ড করে, তাদের কাছে এই ওষুধটির পরীক্ষার কোনও রেকর্ড নেই। অন্য দিকে কোনও প্রতিষ্ঠিত গবেষণা পত্রিকায় এইসব গবেষণার ফল প্রকাশ করা হয়নি। তা ছাড়া নয়া দিল্লির আগরওয়াল হাসপাতালে মাত্র ৪৮ জন রোগীর উপর এই ওষুধ প্রয়োগ করা হয়, যেখানে ড্রাগস অ্যান্ড কসমেটিকস আইন অনুযায়ী অ্যালোপ্যাথিক ওষুধের ট্রায়াল অন্তত ৫০০ জনের উপর করতে হবে এবং তা হবে একাধিক জায়গায়। সুতরাং বিজিআর-৩৪ 'বৈজ্ঞানিকভাবে পরীক্ষিত' এবং 'অ্যালোপ্যাথিক মান' পূরণ করে— এই দাবিগুলির সত্যতা নেই।

দুঃখের বিষয়, তাদের হিন্দুত্ববাদী অ্যাজেন্ডা রূপায়ণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার মৌলিক গবেষণার অর্থ বরাদ্দ ২০০০ কোটি টাকা হ্রাস করেছে। ফলে সিএসআইআর-এর অধীনে দেশে যে ৩৮টি গবেষণা প্রতিষ্ঠান আছে সেগুলি তীব্র অর্থনৈতিক সংকটের সম্মুখীন। ২০১৫ সালে বিজ্ঞান মন্ত্রী হর্ষবর্ধনের নেতৃত্বে সিএসআইআর সিদ্ধান্ত নেয় যে, তাদের বাজেটের ৫০ শতাংশ বাইরে থেকে সংগ্রহ করতে হবে। আশার কথা দেশের প্রতিষ্ঠিত বেশ কিছু বিজ্ঞানী এর প্রতিবাদ করেছেন।

# ফকিরের ঝুলি ভরে দিয়ে এবার নিজেদের ঝুলিও ভরছে ফাটকাবাজরা

'ফকিরের' ঝুলি নাকি ভরে গেছে! কারা ভরল? সে প্রশ্নের উত্তর পেতে গিয়ে চোখ পড়ছে শেয়ার বাজারের দিকে। ভোট মিটতেই হঠাৎ যেন লাফ দিয়েছে শেয়ার বাজারের সূচক। সংবাদপত্রের শিরোনামে বারবারই স্থান পাচ্ছে তেজি শেয়ার বাজারের কথা। প্রচার হচ্ছে, বিজেপির সরকার প্রতিষ্ঠায় নিশ্চিন্ত বোধ করছেন বড় বড় বিনিয়োগকারীরা।

শেয়ার বাজারের এই হঠাৎ রকেট গতির উত্থানের পিছনে রহস্য কী? দেখা যাচ্ছে বোম্বে স্টক এক্সচেঞ্জে ২৪ মে একদিনেই লেনদেন হয়েছে ২ লক্ষ ৬০ হাজার কোটি টাকা। এই লেনদেনের বেশিটা হয়েছে মূলত সিকিউরিটি বন্ড, নানা ঋণপত্র, পেনশন ফান্ড ইত্যাদি সুদের ব্যবসায় বিদেশি বিনিয়োগের হাত ধরে। যার পোশাকি নাম হল ফরেন পোর্টফোলিও ইনভেস্টমেন্ট। একই সাথে পরিমাণে কম হলেও দেশীয় বিনিয়োগও হয়েছে একই কারবারে। আর তার সাথে আছে পুরনো শেয়ারের দর নিয়ে ফাটকার লেনদেন। এর অর্থ একদিনের মধ্যে এত বিশাল লেনদেনের বেশিরভাগটাই হয়েছে এমন কারবারের হাত ধরে, যার কোনও স্থায়িত্ব নেই। 'ফরেন' কিংবা নিখাদ দেশি যেটাই হোক না কেন, পোর্টফোলিও ইনভেস্টমেন্ট অর্থাৎ টাকাকড়ি ও সুদের কারবারের এই শেয়ার বেচাকেনা অনেকটা জুয়াখেলার মতো। সুদখোর, ফাটকাবাজ পুঁজি মালিকরা সুযোগ বুঝে এই সমস্ত বন্ড ইত্যাদি কিনতে শুরু করে তার দর হঠাৎ বাড়িয়ে দেয়। যার আকর্ষণে সাধারণ মানুষও এগুলি কিনতে শুরু করেন। অল্প সময়েই তার থেকে বিপুল মুনাফা তুলে নিয়ে ফাটকাবাজরা বিনিয়োগের পাততাড়ি গুটিয়ে উধাও হয়ে যায়।

সাধারণ ছোট লগ্নিকারী বা সাধারণ মানুষ যাঁরা শেয়ারে বিনিয়োগ করে সঞ্চয়ের আশা করেন, তাঁদের শেয়ার, ফান্ড, বন্ডের কাগজগুলোর তখন ডাস্টবিন ছাড়া অন্য কোনও গতি থাকে না। শেয়ার বাজারের এই বিনিয়োগ মানে কোনওভাবেই শিল্প কিংবা ব্যবসায় নতুন বিনিয়োগ নয়। এই লেনদেন যত লক্ষ কোটি টাকাই হোক না কেন, তার সাথে শিল্প চাঙ্গা হওয়া বা ভোগ্যপণ্যের বিক্রি বাড়ার কোনও সম্পর্ক নেই। কারণ একই শেয়ারের হাতবদলের জন্য স্টক এক্সচেঞ্জে যে ফাটকার কারবার চলে তাতে বিনিয়োগ হওয়া টাকা কোনও উৎপাদনে ব্যয় হয় না।

বড় বড় ব্যবসাদার, পুঁজিপতিরা ভোটে বিজেপিকে জেতাতে যে ৯ লক্ষ কোটি টাকা ঢেলেছে তা তারা উসুল করে নেবেই। সেই কারণেই নরেন্দ্র মোদিদের জয়ের সংবাদ পেয়েই তারা উল্লসিত। তারা কৃত্রিমভাবে শেয়ারের দর একলাফে অনেকটা বাড়িয়ে দিয়ে ওৎ পেতে বসে থাকে। সাধারণ লগ্নিকারীরা এই চড়া দরের আকর্ষণে শেয়ার বিক্রি করতে গেলেই ফাটকবাজরা শেয়ারের দাম তলানিতে নামিয়ে দেয়, কমদামে ভাল শেয়ারগুলি কিনে নিয়ে তারা আবার শিকার ধরার আশায় বসে থাকে। এইভাবে শেয়ার বাজারের দর কখনও চাঙ্গা হয় কখনও ঝিমিয়ে পড়ে। এর সাথে অর্থনীতির সামগ্রিক ভালমন্দের কোনও সম্পর্ক কখনও ছিল না, আজও নেই। 'ফকির' নরেন্দ্র মোদিজির দল বিজেপির ঝুলি ভরাতে দেশি-বিদেশি সুদখোর পুঁজি মালিক ও ফাটকাবাজরা টাকা ঢেলেছিল। এখন চাঙ্গা শেয়ার বাজারের ফাঁদ পেতে তারা তার বহুগুণ বেশি উশুল করছে।

# ২১ ছাত্রের মৃত্যু নগ্ন করে দিল ‘উন্নত’ গুজরাটের ভেতরকার চেহারা

২৪ মে গুজরাটের সুরাটে একটি বহুতল বিল্ডিংয়ে অগ্নিকাণ্ডে সেখানের এক কোচিং সেন্টারের ২১ জন ছাত্রছাত্রী আগুনে দগ্ধ হয়ে অথবা প্রাণ বাঁচাতে গিয়ে ঝাঁপ দিয়ে মারা গিয়েছেন। সারা দেশের মানুষ টিভি চ্যানেলে সেই আতঙ্কের দৃশ্য দেখে শিউরে উঠেছেন। এই ধরনের ঘটনা গুজরাটে এই প্রথম নয়। গত দু’বছরে এই সুরাট শহরেই ১১টি অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে। তাতে ২৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিজয় রূপানিকে দেওয়া এক স্মারকপত্রে এস ইউ সি আই (সি) গুজরাট রাজ্য সম্পাদক কমরেড মীনাক্ষী যোশী প্রশ্ন তুলেছেন, এ থেকে কী শিক্ষা নিয়েছে রাজ্যের বিজেপি সরকার? কী ভূমিকা নিয়েছে মানুষকে বাঁচানোর?

সরকার যে কোনও ভূমিকাই পালন করেনি! ২১ জন ছাত্রছাত্রীর মর্মান্তিক মৃত্যু সেটাই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল।

সংবাদে ইতিমধ্যেই প্রকাশিত, বিল্ডিংটি নির্মিত হয়েছে বেআইনিভাবে। অনুমতি নাকি ছিল একটি মাত্র ঘর তৈরির। সেখনে বহুতল উঠে গেল অথচ বিজেপি সরকারের কর্তারা দেখতে পেলেন না— এ কি আদৌ বিশ্বাসযোগ্য? না কি তাদের দৃষ্টিকে ঝাপসা করে দিয়েছে কালো টাকার পাহাড়? এই বহুতলটির ছাদে ছিল কোচিং সেন্টার। তার দেওয়াল এবং ছাদ ছিল প্লাস্টিকের তৈরি। আগুন লাগলে সেখান থেকে বেরোনোর কোনও বিকল্প রাস্তা ছিল না। এ সি ডাক্ট থেকে আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়লেও নেভানোর কোনও ব্যবস্থা ছিল না। সব শেষ হয়ে যাওয়ার পর রাজ্যের সমাজকল্যাণমন্ত্রী কিশোর কানানির বোধেদয় হয়েছে, বলেছেন, ‘এই বাড়িটিই বেআইনি ছিল ও অগ্নি নির্বাপক কোনও ব্যবস্থা ছিল না। তারা আগুন প্রতিরোধ করার কোনও ব্যবস্থাই রাখেনি। (এই সময় ১৫.০৫.২০১৯)।

উন্নয়নের স্বর্গরাজ্য গুজরাটের দমকল বাহিনী কার্যত ঠুঁটো বলে প্রমাণ হল। উন্নত যন্ত্রপাতি দূরের কথা, ছাত্রছাত্রীরা লাফিয়ে যাতে প্রাণ বাঁচাতে পারে তার জন্য একটু জালের ব্যবস্থাও করতে পারেনি তারা! এই সমস্ত ঘটনা দেখিয়ে দেয় গুজরাটে জনস্বার্থ কী সাংঘাতিকভাবে উপেক্ষিত, অবহেলিত। অথচ এই গুজরাটকেই সম্পূর্ণ মিথ্যার মোড়কে ভাইব্র্যান্ট গুজরাট হিসাবে দিনের পর দিন প্রচার করেছে বিজেপি নেতারা এবং বুর্জোয়া মিডিয়া।

সে প্রচারে বিভ্রান্ত হয়েছে অনেকেই। কিছু ঝাঁ চকচকে রাস্তা আর উড়ালপুল অথবা সুদৃশ্য বিল্ডিং করাই যে উন্নয়ন নয়, উন্নয়ন বলতে যে বোঝায় জনস্বার্থের উন্নয়ন, উন্নত নাগরিক জীবন, উন্নত শিক্ষাব্যবস্থা, উন্নত চিকিৎসাব্যবস্থা, চাকরির সহজলভ্যতায়— এগুলো কোথায়? মুষ্টিমেয় পুঁজিপতির স্বার্থ রক্ষা করাই তো যথার্থ উন্নয়নের মাপকাঠি হতে পারে না।

গুজরাটের ভেতরটা যত ফোঁপরাই হোক, বাইরের চাকচিক্য দেখে সম্প্রতি মোদি ভক্ত হয়েছেন, রায়গঞ্জের সিপিএম সমর্থক রিনা সাহা। বিজেপির হয়ে প্রচার করা তাঁর এক ভিডিও ভাইরাল হয়ে দেশ জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে। তা নাকি মোদির কছেও পৌঁছেছে। কী বলেছেন রিনা?

বলেছেন “হাম কাস্তে-হাতুড়ি-তারা হ্যায়। কিন্তু আমি মোদি সরকার কো সাপোর্ট করতা হ্যায়।” গুজরাট মে স্বর্গ হুয়া হ্যায়। রিনা সহ সিপিএমের সব কর্মী-সমর্থক যারা বিজেপিকে সমর্থন করেছেন, ভোট দিয়েছেন, তাঁদের ভেবে দেখতে অনুরোধ করব কী ধরনের স্বর্গ রাজ্য মোদি সরকার তৈরি করেছে। পশ্চিমবঙ্গে যে বিজেপিকে ১৮টি আসনে জয়ী হতে তাঁরা সাহায্য করলেন, সেই বিজেপি রাজ্যে রাজ্যে কী রকম জনবিরোধী নীতি নিয়ে চলছে একবার ভেবে দেখুন। বিজেপি সোনার বংলা গড়বে না, বাংলার সংস্কৃতি, বাংলার প্রগতিশীল চিন্তাধারাকে ধ্বংস করে বাংলাকে কয়েক যুগ পিছিয়ে দেবে ভেবে দেখুন। গুজরাটকে স্বর্গ বললে নরকও লজ্জা পায়।

# ভাটপাড়ায় শান্তি ফিরিয়ে আনুন

## স্মারকলিপি এস ইউ সি আই (সি)-র

সদ্যসমাপ্ত নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ভাটপাড়া বিধানসভার অন্তর্গত কাঁকিনাড়া অঞ্চলে তৃণমূল ও বিজেপির পারস্পরিক সন্ত্রাসে পরিস্থিতি যেভাবে অশান্ত ও সংঘাতপূর্ণ হয়ে উঠেছে দ্রুত তার অবসান চেয়ে ব্যারাকপুর মহকুমার পুলিশ কমিশনারকে ২২ মে স্মারকলিপি দিল এস ইউ সি আই (সি)।

সেখানে গত কয়েকদিন ধরেই মুহুর্মুহু বোমাবর্ষণ, ইট-পাটকেল বর্ষণ, বাড়িঘর ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ, লুঠতরাজ হচ্ছে। পরিস্থিতি এত ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে যে দুষ্কৃতকারীরা চলন্ত ট্রেন লক্ষ্য করেও ইট, পাথর এবং বোমাও ছুড়েছে। এসব ঘটনা বেশ কয়েকদিন ধরে ঘটে চলেছে। এখনই এই বিষাক্ত পরিস্থিতি সামাল দিতে না পারলে এই গোলমাল এবং সংঘর্ষ ভ্রাতৃঘাতী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সৃষ্টি করতে পারে বলে আশঙ্কা করে সরকারের কাছে এস ইউ সি আই (সি) দাবি জানিয়েছে, অবিলম্বে কাঁকিনাড়ার জনজীবনের পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে পুলিশ ও প্রশাসনকে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, সমস্ত বন্ধ হয়ে যাওয়া চটকল সহ কারখানা, দোকানপাট, স্কুল খোলানোর এবং সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক চলাফেরার ব্যবস্থা করার, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টকারী দুষ্কৃতী এবং দাঙ্গাবাজদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার করার এবং কঠোর শাস্তি, লুটপাট এবং দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্তদের উপযুক্ত আর্থিক ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করতে হবে। ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন দলের উত্তর ২৪ পরগণা জেলা কমিটির পক্ষে কমরেডস অমল সেন ও প্রদীপ চৌধুরী।

# পাঁচ বছরে দিয়েছেন ফাঁপা অর্থনীতি এবার কোন চমক!

পাঁচ বছরে সে শুধু দূরেই সরে গেছে! তাহলে কি এবার ধরা দেবে নরেন্দ্র মোদি প্রতিশ্রুত সেই অধরা ‘আচ্ছে দিন’? ভোটে তাঁর যত বিপুল জয়ই হোক না কেন, দেশের সাধারণ মানুষ তো বটেই মোদি সাহেবের সবচেয়ে বড় সমর্থক শিল্পপতিরাও তা মনে করছেন না। তাই ২৩ মে ভোটের ফল বেরোতে না বেরোতেই টুইট করে অর্থনীতির বেহাল দশার কথা মোদিজিকে স্মরণ করাতে গিয়ে হর্ষ গোয়েঙ্কা থেকে শুরু করে বেশ কয়েকজন শিল্পপতিও বলেছেন, কর্মসংস্থান, কৃষকের ফসলের দামের নিশ্চয়তা, কারখানায় উৎপাদন বৃদ্ধি এবং পরিকাঠামো উন্নয়নের মতো কাজগুলি না হলে অর্থনীতির চাকা গড়াবে না। তাঁরা এনএসএসও-র মতো সমীক্ষা সংস্থা বা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের উপর সরকারি খবরদারি বন্ধের দাবিও তুলেছেন।

অর্থাৎ শিল্পপতিরা, যাদের টাকার থলির জোরেই বিশাল জয় হাসিল করেছেন মোদি সাহেব, তারাও আশঙ্কিত যে, মানুষের ক্রয়ক্ষমতা না বাড়লে কোনও স্লোগান, কোনও মেক ইন ইন্ডিয়া, আম্বানি-আদানি-টাটা-হিন্দুজাদের মালিকানায় কামান-বন্দুক কিংবা যুদ্ধবিমান-সাবমেরিনের কারখানা এর কোনও কিছু দিয়েই এই ভেঙে পড়া অর্থনীতির চাকাকে গর্ত থেকে তোলা যাবে না। সিঙ্গুরে টাটাকে ফিরিয়ে আনার চমক দিয়ে একদা ফিল্ম স্টার বিজেপি সাংসদ থেকে শুরু করে হতাশ সিপিএম পর্যন্ত যতই চোখের জল ফেলুক না কেন, সমগ্র গাড়ি শিল্পে অন্ধকার নেমে এসেছে। এমনকী টু-হুইলারের বিক্রি পর্যন্ত পুরোপুরি স্তব্ধ হতে বসেছে। সিঙ্গুর থেকে গুজরাটে চলে যাওয়া ন্যানো কারখানা অবশ্য আগেই লালবাতি জ্বেলেছে। সানন্দ থেকে উচ্ছেদ হওয়া মানুষগুলিকে পুরোপুরি পথে বসিয়ে, শিল্পায়নের নামে সরকারি কোষাগারের ৩৬ হাজার কোটি টাকা আত্মসাৎ করে, প্রোমোটারদের স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠার সুযোগ করে দিয়ে টাটা সাহেবরা ন্যানো প্রকল্প গুটিয়ে বিদায় নিয়েছেন। অবশ্য পশ্চিমবঙ্গ থেকে ন্যানোর নামে ১ শতাংশ সুদের ২০ হাজার কোটি টাকা ঋণও ‘শিল্পায়নের’ মহৎ কার্যে ওই গোষ্ঠীর মালিকদের পকেটেই বিলীন হয়ে গেছে। কিন্তু সে প্রসঙ্গ আপাতত থাক।

প্রধানমন্ত্রীর আর্থিক উপদেষ্টা পরিষদের অন্যতম সদস্য রথীন রায় কী বলছেন দেখা যাক— তাঁর মতে দেশের ১৩০ কোটি লোকের মধ্যে ১০ কোটি লোকের কেনাকাটাই অর্থনীতিকে কিছুটা বাঁচিয়ে রেখেছে। বাকিরা বাস্তবে বেঁচে থাকার মতো সামান্য কিছু নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস ছাড়া ভোগ্যপণ্য প্রায় কেনে না বললেই চলে। তাঁর অভিমত এই বাজার আর বাড়ছে না। বরং মধ্য আয়ের লোক ক্রমাগত কমছে। একদিকে মুষ্টিমেয় ধনকুবেরদের সম্পদ বাড়ছে আকাশ ছোঁয়া হারে, অন্যদিকে দেশের বেশিরভাগ মানুষের আয় দ্রুত কমছে। তাহলে শিল্প, কর্মসংস্থান হবে কোন ম্যাজিকে?

২৬ মে প্রকাশিত একটি সংবাদ এই বিষয়ে আরও মারাত্মক খবর দিচ্ছে। দেখা যাচ্ছে জমি-বাড়ি থেকে শুরু করে ভোগ্য পণ্যের কেনাকাটার অধিকাংশটাই হচ্ছে ঋণ নির্ভর। মোদি জমানার বিগত কয়েক বছরেই এই খাতে অনাদায়ী ঋণ ৮০ শতাংশ বেড়ে হয়েছে ৬ লক্ষ ৭০ হাজার কোটি টাকা (আনন্দবাজার পত্রিকা ২৬.০৫.২০১৯)। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, মোদির ডিজিট্যাল ইন্ডিয়ার উৎসাহে ব্যাঙ্কগুলি অসংখ্য ক্রেডিট কার্ড বিক্রি করে চলেছে। পকেটের সামান্য নগদে টান পড়ছে না বলে মানুষ খেয়ালও করছে না তার কেনার প্রকৃত ক্ষমতা কতটুকু। ফলে ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে সামর্থ্যের বাইরে গিয়েও ভোগ্য পণ্য কিনছে অনেকে। কিন্তু আয়ের স্থিরতা এবং কর্মসংস্থানের কোনও ব্যবস্থা না থাকায় এই ঋণ ক্রমে জমতে জমতে পাহাড় প্রমাণ হয়ে উঠছে। ফলে বহু পরিবারেই নেমে আসছে সংকট।

ন্যাশনাল স্যাম্পল সার্ভে অর্গানাইজেশন (এনএসএসও) জানাচ্ছে মোদি জমানায় বেকারি বেড়েছে ৪৫ বছরে সর্বাধিক। এই বেকারি ক্রমবর্ধমান, অর্থনীতির যে সব বিশেষজ্ঞ মোদিজির নেতৃত্বে অর্থনীতির ঘুরে দাঁড়ানোর খোয়াব দেখাচ্ছিলেন মানুষকে, তাঁরাও এখন আতঙ্কিত হয়ে বলতে শুরু করেছেন, কর্মসংস্থান এবং আয়ের সুযোগ বাড়ানোর ব্যবস্থা না করলে ঋণনির্ভর, ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তোলা ভোগ্যপণ্যের এই কৃত্রিম বাজার অচিরেই ভেঙে পড়বে। আজ পুঁজিবাদী দুনিয়ার ইঞ্জিন বলে কথিত আমেরিকাও এই ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তোলা ঋণনির্ভর অর্থনীতির জোরে বাজারকে চাঙ্গা রাখতে গিয়ে বারবার সংকটে ডুবছে। শুধু ২০০৮-এর সাবপ্রাইম ঋণ সংকট নয়, সর্ব ক্ষেত্রেই এই সংকট তাকে গ্রাস করছে। ইউরোপের অর্থনীতিও দাঁড়িয়ে আছে এই ঋণ চালিত অর্থনীতির উপরই। পুঁজিবাদী বিশ্বের সর্বত্রই আজ এই পরিস্থিতি চলছে। নরেন্দ্র মোদির ম্যাজিক নিয়ে যত প্রচারের চমকই থাকুক না কেন ভারতের পুঁজিবাদী বাজারের পরিস্থিতি অন্য কিছু হতে পারে না। তাই ডিজিট্যাল ইন্ডিয়ার স্লোগান তুলে কার্ডে কেনাকাটা বাড়িয়ে কিছুটা বাজার চাঙ্গা করার চেষ্টা করেছিলেন মোদি সাহেব। কিন্তু তাতেও বিশেষ ফল হয়নি। এখন দেখা যাচ্ছে যেটুকু কেনাকাটা এই পথে তারা বাড়াতে চেয়েছিল সেটাই ব্যুমেরাং হয়ে ফিরে এসে বাজারের সংকটকে আরও বাড়িয়েছে।

নরেন্দ্র মোদি সাহেব এখন তাঁর এককালে তোলা ‘সব কা সাথ সব কা বিকাশের’ স্লোগান থেকে পালিয়ে বাঁচতে চাইছেন। তাই গোটা নির্বাচনী প্রচার পর্বে এ নিয়ে একটি শব্দও খরচ করেননি। দেশের মানুষও জানে, নরেন্দ্র মোদির দ্বিতীয় দফার প্রধানমন্ত্রীত্বেও তাদের পাওয়ার কিছু নেই। এই সত্যকে ঢাকতে নতুন কোনও চমক, নতুন কোনও ভড়ং হয়ত খুঁজে বার করবেন মোদি সাহেবের পরামর্শদাতারা। কিন্তু ওই চমকই সার। কোনও কিছু দিয়েই আজ এই সংকট থেকে বেরনোর উপায় তাঁদের হাতে নেই।

# শিক্ষায় শেষ স্থানের দৌড়ে পশ্চিমবঙ্গ

এই রাজ্যের শিক্ষানুরাগী মানুষ একটু ধন্দে পড়েছেন। কয়েকদিন আগে স্কুলশিক্ষার রাজ্য ভিত্তিক মানদণ্ডের উপর কেন্দ্রীয় সরকারের এক সমীক্ষা রিপোর্টে এই রাজ্যের শিক্ষার যে ছবি প্রকাশিত হয়েছে, তার সাথে ১৯ মে প্রকাশিত মাধ্যমিকের ফলাফলে বিপুল সাফল্যের কোনও সঙ্গতি নেই। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকাশিত এই রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে, মাতৃভাষা, অঙ্ক এবং বিজ্ঞানের মূল্যায়নে বিহার, ওড়িশা, আসাম, ঝাড়খণ্ড, উত্তরপ্রদেশের ছাত্রছাত্রীদের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গের ছাত্রছাত্রীরা পড়ে আছে অনেক পিছনে। কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের এই রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে, যে পাঁচটি সূচকে স্কুল শিক্ষা ব্যবস্থার পরিমাপ হয়েছে, তার প্রায় সবকটিতেই পিছনে পড়ে আছে পশ্চিমবঙ্গের স্কুলগুলি। কেরল, তামিলনাড়ু তো অনেক আগেই এই রাজ্যকে পিছনে ফেলেছে। এখন রাজস্থান, হিমাচলপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, হরিয়ানাকে স্পর্শ করাও দুরূহ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এখন সারা দেশে পশ্চিমবঙ্গের স্থান হয়েছে বিহার, উত্তরপ্রদেশ, ঝাড়খণ্ডের সাথে একাসনে। কিন্তু এটাই সব নয়। স্কুল পরিকাঠামোয় পশ্চিমবঙ্গের প্রাপ্ত নম্বর বিহার, উত্তরপ্রদেশের থেকেও অনেক খারাপ। ৩৬টি রাজ্য ও কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলের মধ্যে ৩৫ নম্বরে, কেবল মেঘালয়কে এই রাজ্য হারাতে পেরেছে। অথচ ছাত্রছাত্রীদের সাইকেল দান করা এবং কন্যাশ্রী প্রকল্পের মাধ্যমে কিছু ছাত্রীকে এককালীন ২৫ হাজার টাকা পাইয়ে দেওয়ার স্কিম নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী থেকে শুরু করে শাসক দলের তাবড় তাবড় নেতারা কত আত্মশ্লাঘা অনুভব করেন। কিন্তু তাঁরা একবারও ভেবে দেখেছেন কি এর দ্বারা শিক্ষার মানের কতটা উন্নতি ঘটল? এই প্রকল্পের বিজ্ঞাপনে যে পরিমাণ টাকা খরচ করা হয়েছে, সেই টাকা যদি পরিকাঠামো উন্নয়নে ব্যয় করা হত, তাহলেও হয়তো পরিস্থিতি এতটা খারাপ হত না।

এ বছরের মাধ্যমিকের পাশের হার দেখে কে বলবে আমাদের রাজ্যে স্কুলগুলিতে পড়াশোনা হয় না। তা হলে কি কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রকের এই রিপোর্ট পক্ষপাত দুষ্ট? পশ্চিমবাংলাকে হেয় প্রতিপন্ন করার প্রচেষ্টা? পশ্চিমবাংলার প্রতি কেন্দ্রীয় বঞ্চনার আর এক নিদর্শন। যদি ধরেও নেওয়া যায় কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রকের রিপোর্ট খানিকটা হলেও পক্ষপাতদুষ্ট, তবুও রাজ্যের মানুষের অভিজ্ঞতা তো এই রিপোর্টের সাথেই মিলে যাচ্ছে। তা ছাড়া রিপোর্ট যে তৈরি হয়েছে রাজ্য সরকারের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে!

তা হলে এই ধন্দের নিরসন হবে কী ভাবে? পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রকের সাথে সংশ্লিষ্ট কোনও ব্যক্তির কাছে এই প্রশ্নের উত্তর অজানা নয়। মাধ্যমিক পরীক্ষার পরীক্ষকদের সাথে কথা বললে আপনিও এর উত্তর পাবেন! স্কুলে লেখাপড়ার তদারকিতে যতই গাফিলতি থাকুক না কেন, পরীক্ষায় নম্বর পাইয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে মাধ্যমিক বোর্ডের কোনও কার্পণ্য নেই। পরীক্ষকদের কাছে খাতা দেখার যে নির্দেশাবলি পাঠানো হয়, তাতে পরিষ্কার বলা থাকে যে, ছাত্রছাত্রীদের ফেল করানোটা পরীক্ষকদের উদ্দেশ্য নয়। তাই কোনও ছাত্র সঠিক উত্তর দিতে পেরেছে কি না সেটা বড় কথা নয়, উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছে কি না সেটাই বড় কথা। তাই কোনও প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করলেই তাকে কিছু নম্বর দিতে হবে। তা ছাড়া কোনও ছাত্র যদি ১৩-১৯-এর মধ্যে নম্বর পায়, তা হলে তাকে ২০ নম্বর দিয়ে দেওয়াটা পরীক্ষকের দায়িত্ব। আর ২০ নম্বর পেলেই তো পাশ।

এখানেই শেষ নয়, যাঁরা উত্তরপত্র দেখছেন তাঁরা স্ক্রুটিনি করে পাঠানোর পর প্রধান পরীক্ষকরা আবার বিশেষ ভাবে স্ক্রুটিনি করেন। এখানে নম্বরের অনেক হেরফের হয়ে যায়। কারণ এ বছর যিনি প্রধান পরীক্ষক আছেন, তিনি পরের বছর থাকবেন কি না তা এই নম্বরের উপর নির্ভর করে। এত বেশি পাশের হারের রহস্য এখানেই। নম্বর দেওয়ার এই মারাত্মক প্রবণতা শুরু হয়েছিল বামফ্রন্ট আমলেই। রাজ্যের শিক্ষার মানের মাপকাঠি দাঁড় করানো হল মাধ্যমিকে-উচ্চ মাধ্যমিকে পাশের হার। সিপিএম ফ্রন্ট সরকারের আমলেই পাশের হার বাড়িয়ে রাজ্যের শিক্ষার মানচিত্র কত উন্নত তা প্রমাণ করার চেষ্টা হয়েছে। অন্যান্য বহু ক্ষেত্রের মতো এক্ষেত্রেও তৃণমূল সরকার তাদের শুধু অনুসরণই করেনি, ছাড়িয়ে গেছে।

কিন্তু শিক্ষা নিয়ে এই প্রহসন ও ছেলেখেলা কি চলতেই থাকবে? অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাশ-ফেল তুলে দিয়ে শিক্ষার গোড়ায় কুড়ুল চালানোর যে ব্যবস্থা কায়েম করা হয়েছে, তাতে শিক্ষার মানের অবনমন তো স্বাভাবিক। তার উপর শিক্ষক নিয়োগে গাফিলতি ও দুর্নীতির ফলে স্কুলগুলোতে উপযুক্ত মান ও সংখ্যায় শিক্ষকের অপ্রতুলতা এই সমস্যাকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে। কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রকের রিপোর্টে প্রকাশিত রাজ্যের স্কুলগুলোর দৈন্যদশায় যে চিত্র বেরিয়ে এসেছে তাতে সরকারের নেতা-মন্ত্রীদের সম্বিত ফিরবে কি? না হলে শিক্ষাক্ষেত্রে এক সময় এগিয়ে থাকা পশ্চিমবঙ্গ শেষেরও নিচে নেমে যাবে।

# সুদান

## এবার মিলিটারি শাসনের বিরুদ্ধে পথে নেমেছে মানুষ

আরও একবার আন্দোলনের ময়দানে সুদানের সাধারণ মানুষ। এবার তাদের লক্ষ্য অন্তর্বর্তী সামরিক শাসন হটিয়ে গণতান্ত্রিক সরকার গঠন করা। মূল্যবৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক দুরবস্থার প্রতিবাদে গত কয়েক মাস ধরে বারে বারেই পথে নেমেছে সুদানের জনতা। গত মাসে তাদের দাবি মেনে পদত্যাগ করেন প্রেসিডেন্ট ওমর আল-বশির। অন্তবর্তীকালীন শাসন চালাবার দায়িত্ব নেয় সেনাবাহিনীর সদস্যদের নিয়ে তৈরি ট্রানজিশনাল মিলিটারি কাউন্সিল (টিএমসি)।

প্রথম থেকেই সুদানের মানুষ টিএমসি-র হাত থেকে দেশের শাসন ক্ষমতা নিজেদের হাতে নিতে চেয়েছে। নানা রাজনৈতিক দল, সংগঠন ও সংস্থার প্রতিনিধিরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে তৈরি করেছেন নাগরিকদের সংগঠন 'দি ডিক্লারেশন অফ ফ্রিডম অ্যান্ড চেঞ্জ ফোর্সেস' (ডিএফসিএফ)। সেনাদের সংগঠনের সঙ্গে বার বার বৈঠকও হয়, কিন্তু দেশের সার্বভৌম কাউন্সিল কাদের নিয়ে গঠিত হবে এবং কে হবেন সুদানের আগামী প্রেসিডেন্ট— এ নিয়ে সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে পৌঁছনো যায়নি। সেনাবাহিনী চেয়েছে দেশের শাসন ক্ষমতা নিজেদের কুক্ষিগত করে রাখতে, যার প্রতিবাদে গর্জে উঠেছেন সুদানের সাধারণ মানুষ। বেশ কিছুদিন ধরে তাঁরা রাজপথে অবস্থান বিক্ষোভ চালিয়ে যাচ্ছেন। জনতা রীতিমতো ব্যারিকেড দিয়ে ঘিরে রেখেছে আন্দোলনকারীদের। মিলিটারি কোনও ভাবেই নাগরিকদের দাবি মানতে না চাওয়ায় শেষ পর্যন্ত ধর্মঘটের ডাক দেয় ডিএফসিএফ। সুদানের কমিউনিস্ট পার্টি ডিএফসিএফ সংগঠনটির অংশ হিসাবে ২০ মে এক বিবৃতিতেজানিয়েছে, সার্বভৌম কাউন্সিলের সদস্য ও প্রেসিডেন্ট পদে দেশের অসামরিক সাধারণ মানুষকেই জায়গা দিতে হবে, কারণ আসল লড়াইটা লড়েছেন তাঁরাই। এই দাবিতে আন্দোলন আরও জোরদার করবে সুদানের মানুষ, বিবৃতিতে এই আশা প্রকাশ করা হয়েছে।

ইতিমধ্যে সেনাদের সংগঠন টিএমসি-র ভাইস প্রেসিডেন্ট জেনারেল মোহাম্মদ হামদান ডাগলো জনতার এই বিক্ষোভের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে বলেছেন, আন্দোলনকারীরা দেশের সুস্থিতি নষ্ট করার ষড়যন্ত্র করছেন, এ জিনিস তাঁরা মেনে নেবেন না। এদিকে সেনাদের সমর্থন মাথায় নিয়ে আসরে নেমে পড়েছেন এক ধর্মগুরু আলি আল-গিজৌলি। তাঁর বক্তব্য ডিএফসিএফ যে অন্তর্বর্তী সরকার গড়তে চাইছে, তাকে ইসলামি শরিয়তি আইন মেনে চলতে হবে। এ দাবিও মানতে রাজি নন সুদানের আন্দোলনকারী মানুষ। কারণ অভিজ্ঞতা থেকে তাঁরা জানেন, এই শরিয়তি আইনের দোহাই দিয়েই অতীতে রাজনৈতিক বিরোধীদের বেছে বেছে আক্রমণ করেছে শাসক।

এই পরিস্থিতিতে ডিএফসিএফ-র পাশাপাশি ডাক্তার, শিক্ষক, ফার্মাসিস্ট, আইনজীবী, ইঞ্জিনিয়ার ইত্যাদি সমাজের সর্বস্তরের মানুষের একটি সংগঠন এসপিএ-ও আন্দোলন তীব্রতর করার ডাক দিয়েছে। আইন অমান্য করে ধর্মঘটে সামিল হওয়ার জন্য সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের কাছে আহ্বান জানিয়েছেন তাঁরা।

# জলপাইগুড়ি হাসপাতালে ডেপুটেশন

*২১ মে জলপাইগুড়ি হাসপাতালে ব্লাড ব্যাংকে রক্ত সংকট, ডাক্তার ও নার্সের অভাব, প্যাথোলজি ডিপার্টমেন্টের অব্যবস্থা, স্থায়ী কর্মীর বদলে অস্থায়ী স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগ ইত্যাদি সমস্যার সমাধানের দাবিতে এস ইউ সি আই (সি) দলের জলপাইগুড়ি লোকাল কমিটির পক্ষ থেকে বিক্ষোভ দেখানো হয়। পরে এক প্রতিনিধি দল সিএমওএইচ-এর কাছে ডেপুটেশন দেন।*

# কোচবিহারে ছাত্র-যুব শিক্ষাশিবির

২০ মে এ আই ডি এস ও এবং এ আই ডি ওয়াই ও-র উদ্যোগে কোচবিহারের তুফানগঞ্জ লোকাল কমিটির পক্ষ থেকে শিক্ষা-সংস্কৃতি-মনুষ্যত্ব রক্ষার্থে ছাত্র-যুব শিক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত হয় মুগাভোগ প্রাইমারি স্কুলে। প্রধান অতিথি ছিলেন বিশিষ্ট কৃষক নেতা কমরেড দেবেন বর্মন এবং প্রধান আলোচক ছিলেন এ আই ডি এস ও-র রাজ্য সম্পাদক কমরেড সৌরভ ঘোষ।

# পাঠকের মতামত

## রূপকথা নয়, বাস্তব

উত্তর ২৪ পরগনা জেলার গোপালনগর নহাটা সারদাসুন্দরী বালিকা বিদ্যামন্দিরের ঘটনা। মাধ্যমিকের টেস্ট পরীক্ষায় অকৃতকার্য ৫০ জন ছাত্রীকে নিয়ে যাত্রা শুরু এই রূপকথার। ওদের মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসিয়ে পাশ করানোর প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে গড়ে উঠল এক নতুন প্রেরণাদায়ক কাহিনী। স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা শম্পা পাল, সহ শিক্ষিকা সোহিনী বিশ্বাস, অর্পিতা নাথ, সুজাতা রায়ের মতো অন্যান্য দিদিমণিদের সাহায্য নিয়ে গ্রহণ করেছিলেন এই চ্যালেঞ্জটা। ১৭০ জনের ব্যাচে টেস্টে অনুত্তীর্ণ এই ৫০ জনকে পাশ করানোর লড়াইটা শুরু হয়েছিল বিশেষ কয়েকটি কারণে। অকৃতকার্যদের বসতে না দিলে অনেকেরই এখানেই পড়াশোনার পরিসমাপ্তি ঘটবে। তাছাড়া অধিকাংশ নিম্নবিত্ত পরিবারের এসব মেয়েদের পরিবারের পক্ষ থেকে তড়িঘড়ি বিয়ে দেওয়ারও ব্যবস্থা হয়ে যাবে একই কারণে। এসব ভেবে শিক্ষিকারা এই সংকল্প নিয়েছিলেন যে, যেভাবেই হোক এদের পাশ করার মতো যোগ্য করে মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসাতে হবে। এজন্য চাই প্রয়োজনীয় যত্ন আর সঠিক পরিকল্পনা। অভিভাবকদের ডেকে পাঠানো হল স্কুলে। মুচলেকা লিখিয়ে নেওয়া হল সকলকে দিয়ে। অভিভাবকরা কথা দেন, ছুটির মধ্যেও প্রত্যেক দিন মেয়েকে পড়তে পাঠাবেন স্কুলে। আর কোনও গৃহশিক্ষক রাখা চলবে না। যা হওয়ার স্কুলের দিদিমণিদের হাত ধরেই হবে। বিশেষ ক্লাসের ব্যবস্থা হয় ২০ ডিসেম্বর থেকে ৭ ফেব্রুয়ারি। ২৫ ডিসেম্বর, পয়লা জানুয়ারির মতো উৎসবের দিনেও বন্ধ হয়নি বিশেষ প্রশিক্ষণ। সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত চলত বিশেষ তালিম। অনেকে অনেক বিষয়ে পিছিয়ে, তাদের এগিয়ে দেওয়ার সব রকম প্রচেষ্টা চালিয়ে গেলেন দিদিমণিরা। শেষ পর্যন্ত সফল হলেন। ৫০ জনের মধ্যে ৪৮ জন মাধ্যমিকের গণ্ডি পার হতে সমর্থ হল। দিদিমণিদের সাথে হাসি ফুটল কোয়েল, আসমিনা, বিজ্ঞানী, প্রিয়াংকাদের মুখেও।

শিক্ষিকাদের প্রশংসা করার কোনও ভাষা নেই। টেস্টে ফেল করে তো অনেকেই মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিক দিতে পারে না। কিন্তু এভাবে কত জনের হাত ধরে টেনে তোলেন মাস্টারমশাই-দিদিমণিরা ? শুধু গোপালনগর কেন, শিক্ষকসমাজ চাইলে সারা দেশের চিত্র তো এমন হতে পারে। একটা আদর্শকে ভিত্তি করে লক্ষ্য পূরণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলে বহু বাধাকে যে এভাবে জয় করা যায় তা এই ঘটনার দ্বারা আরও একবার প্রমাণিত হল। এ বাধা-জয় শুধু ওই ছাত্রীদের নয়, এখানে শিক্ষিকারাও একটা জয়ের স্বাদ পেলেন। প্রধান শিক্ষিকার কথায়, 'ফল নিয়ে খুব টেনশনে ছিলাম। পরীক্ষা তো ওদের নয়, যেন আমরা দিদিমণিরাই নতুন করে একবার মাধ্যমিকে বসলাম।' এই ঘটনার মধ্য দিয়ে ছাত্রী-শিক্ষিকাদের মধ্যে যে সম্পর্ক তৈরি হল তাও তো এই সমাজের কাছে এক দুর্লভ সম্পদ! আজ গভীর দুঃখের সাথে লক্ষ করছি ছাত্র-শিক্ষকদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে নানা জটিলতা, দুস্তর দূরত্ব যা পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা-ভালবাসাকে কেড়ে নিচ্ছে। এমন ঘটনা এ জাতীয় সমস্যা থেকে উত্তরণেরও একটা পথ হিসাবে বিবেচিত হতে পারে। ছাত্র-ছাত্রী এবং শিক্ষক-শিক্ষিকা— দু'পক্ষের এমন উত্তরণ আবার সমাজটাকেও বহু দূর এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে। প্রমাণিত হল, গোপালনগরের ওই স্কুলের শিক্ষিকারা শুধু চাকরি করতে আসেননি। তাঁরা এসেছেন শিক্ষাদান করতে, জ্ঞানের আলো সমস্ত স্তরে পৌঁছে দিয়ে সমাজের অন্ধকার দূর করতে।

শিক্ষক সমাজের এমন আচরণ এই সমাজে হয়তো নতুন নয়। কিন্তু পুঁজিবাদী ব্যবস্থা, তার সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল আজ শিক্ষক সমাজের অনেকাংশকে এমন এক জায়গায় ঠেলে দিয়েছে যেখানে এ জাতীয় চিন্তা ভাবনা তাঁদের কাছে একরকম ব্রাত্য।

বিদ্যাসাগরের জন্মের ২০০ বছর পূর্তির প্রাক্কালে তাঁরই আদর্শের এমন এক ঝলক আমাদের নতুন আশায় উজ্জীবিত করল। (সূত্র ঃ আনন্দবাজার পত্রিকা, ২২/৫/১৯)

**গৌরীশংকর দাস,**
সাঁজোয়াল, খড়গপুর

## জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জের গ্রেপ্তারির পিছনে

উইকিলিক্স-এর প্রতিষ্ঠাতা জুলিয়ান পল অ্যাসাঞ্জ একজন অস্ট্রেলিয়ান সাংবাদিক এবং কম্পিউটার প্রোগ্রামার। তিনি সাহসের সঙ্গে বিভিন্ন যুদ্ধাপরাধ, মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা, দুর্নীতি, প্রভৃতির সংবাদ উইকিলিক্স- এর মাধ্যমে প্রকাশ করতেন। ২০১০ সালে উইকিলিক্স প্রায় সাড়ে সাত লক্ষ অত্যন্ত সংবেদনশীল সামরিক ও কূটনৈতিক তথ্য প্রকাশ করে। এর মধ্যে ছিল ২০০৭ সালে বাগদাদে আমেরিকার আকাশ হানার ভিডিও, যা বিশ্বের মানুষের কাছে এই হানার নৈতিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দেয়;আফগানিস্তানে আমেরিকার আক্রমণ সংক্রান্ত বেশ কিছু গোপন তথ্য, আমেরিকার ইরাক আক্রমণ সংক্রান্ত ডকুমেন্ট, ইউনাইটেড স্টেটস ডিপ্লোমেটিক কেবলস লিক প্রভৃতি। কেবলস লিকের পর আমেরিকা সরকার উইকিলিক্স-এর বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করে এবং তার সহযোগী দেশগুলিকেও তা করতে বলে। সুইডেন অ্যাসাঞ্জ-এর বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করে। ২০১২ সালের জুন মাসে তিনি ইকুয়েডরের কাছে কূটনৈতিক আশ্রয় চান এবং ওই বছর আগস্ট মাসে তাঁকে আশ্রয় দেওয়া হয়। তিনি লন্ডনের ইকুয়েডর দুতাবাসে থাকতে শুরু করেন। কিন্তু ইকুয়েডর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে একের পর এক বিরোধের ফলে গত ১১ এপ্রিল ২০১৯ তাঁর কূটনৈতিক আশ্রয় প্রত্যাহার করা হয় এবং ওই দিনই অ্যাসাঞ্জকে লন্ডনের ইকুয়েডর দুতাবাস থেকে লন্ডনের পুলিশ গ্রেপ্তার করে। এর উদ্দেশ্য, পশ্চিমী দুনিয়া তাদের দমন-পীড়নমূলক, পচনশীল, প্রতিহিংসাপরায়ণ শাসন ব্যবস্থাকে বিশ্বের জনগণের কাছ থেকে আড়াল করতে চাইছে কারণ অ্যাসাঞ্জ ও তাঁর সহযোগীরা বিভিন্ন দেশের অন্যায় কার্যকলাপ, মানবাধিকার লঙ্ঘন, মানবতার প্রতি অপরাধ প্রভৃতি তুলে ধরে সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী শোষণ-নিপীড়নের ঘটনাগুলিকে বিশ্বের সামনে তুলে ধরছে। তিনি বিভিন্ন তথ্য ভাণ্ডার থেকে তথ্য সংগ্রহ করে পশ্চিমী দুনিয়া যে সব নৃশংস অপরাধমূলক কাজ বছরের পর বছর করে চলেছে, তা বিশ্বের সামনে তুলে ধরে এই দেশগুলির ভণ্ডামির মুখোশ খুলে দিচ্ছেন এবং বিশ্বকে পরিবর্তনের প্রয়াস চালাচ্ছেন। আফগান জনসাধারণের প্রতি আমেরিকাসহ পশ্চিমী দুনিয়া যে অপরাধ করেছে, আফ্রিকা, এশিয়া, ল্যাটিন আমেরিকা ও মধ্য প্রাচ্যে নয়া উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ মানুষের জীবনে যে দুর্দশা ডেকে আনছে তা অ্যাসাঞ্জ ও তাঁর সঙ্গীরা তুলে ধরছেন। তাঁরা পশ্চিমী দুনিয়ার মানুষের সামনে প্রকৃত সত্যকে তুলে ধরছেন যাতে তারা সমাজ পরিবর্তনের জন্য প্রয়াসী হতে পারে। উইকিলিক্স-এর সমালোচকরা চান না যে লক্ষ লক্ষ মানুষের দুর্দশার কথা মানুষ জানতে পারুক যাতে পশ্চিমী দুনিয়া নিরাপদ বোধ করতে পারে।

**প্রদীপ কুমার দত্ত**
কলকাতা

## সরকারি সহায়ক মূল্যে সমস্ত ধান কেনার দাবি কৃষক সংগ্রাম পরিষদের

সাম্প্রতিক ঘূর্ণিঝড় ফণীর তাণ্ডবে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের বিমা কোম্পানির দেয় ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য আবেদনপত্র জমা দেওয়ার সময়সীমা বাড়ানোর দাবিতে রাজ্যের কৃষি উপদেষ্টা ও কৃষিমন্ত্রীকে ৯ মে চিঠি দেয় কৃষক সংগ্রাম পরিষদ। পরিষদের সম্পাদক নারায়ণ চন্দ্র নায়ক বলেন, ৩ মে ফণীর কারণে বৃষ্টির দরুন বহু কৃষকের বোরো ধান মাঠে নষ্ট হয়েছে।

এর পর বিমা কোম্পানি কৃষি দপ্তরের সাথে কথা বলে ৪ ও ৫ মে জলে নষ্ট হওয়া খেতের ছবি সহ দরখাস্ত তাদের কাছে অনলাইনে জমা দিতে বলে কৃষককে। কিন্তু বহু কৃষক বিষয়টি নির্দিষ্ট সময়ে জানাতে না পারায় ওই আবেদন করতে পারেননি। পরিষদের চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে কৃষি উপদেষ্টা জানান, রাজ্য সরকার বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করছে, নির্বাচন পর্ব মিটলে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

অন্যদিকে বোরো মরশুমের ধান অবিলম্বে খাদ্য দপ্তরের স্থায়ী কেন্দ্রে (ব্লক পিছু) এখনই সরকারি সহায়ক মূল্যে কেনা শুরু করার দাবিতে ১৩ মে রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রীকে কৃষক সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে চিঠি দেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে মে মাসের তৃতীয় সপ্তাহ থেকে ফের ক্রয়কেন্দ্রে ধান কেনার কাজ শুরু হয়েছে। কৃষক সংগ্রাম পরিষদের দাবি, গ্রাম পঞ্চায়েত পিছু ক্যাম্প করে মাইক প্রচারের মাধ্যমে চাষিকে জানিয়ে তাদের সমস্ত ধান ক্রয় করতে হবে। নির্বাচনের কারণে ওই ধান ক্রয়কেন্দ্র বন্ধ থাকায় ফড়েদের কাছে চাষিরা অনেক কম দামে চলতি বোরো মরশুমের ধান বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছে বলে পরিষদের অভিযোগ।

## গুজরাটে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ২১ ছাত্রের মর্মান্তিক মৃত্যু

### মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি গুজরাট এস ইউ সি আই (সি)-র

গুজরাটে সুরাটের একটি কোচিং সেন্টারে সাম্প্রতিক অগ্নিকাণ্ডে ২১ জন ছাত্রছাত্রীর মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। এই ঘটনায় তীব্র শোক জ্ঞাপন করে এস ইউ সি আই (সি)-র গুজরাট রাজ্য সংগঠনী কমিটির পক্ষ থেকে রাজ্যের বিজেপি সরকারের মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে একটি চিঠি পাঠানো হয়।

চিঠিতে বলা হয়েছে, ''সুরাটের মর্মান্তিক অগ্নিকাণ্ডে শোক প্রকাশের ভাষা আমরা হারিয়ে ফেলেছি। আপনার কাছে প্রশ্ন— ২১ জন তরতাজা ছাত্রের প্রাণ কেড়ে নিল যে দুর্ঘটনা, তা ঘটবার পরিস্থিতি কে তৈরি করেছে? গত দু' বছরে শুধু সুরাটেই ১১টি অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে যেগুলির কারণে ঝরে গেছে ২৭টি প্রাণ। এসব থেকে আপনার সরকার কি কোনও রকম শিক্ষা নিয়েছে, নাকি, প্রতিবারই আগের বারের মতো কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার পুরনো বুলি আউড়ে দুর্ঘটনার কথা ভুলে গেছে?''

চিঠিতে বলা হয়েছে, গুজরাটে অগ্নিসুরক্ষার নিয়মকানুন কখনওই সঠিক ভাবে মানা হয় না। গোটা রাজ্য জুড়েই কোচিং সেন্টারগুলি নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে রমরমিয়ে চলছে। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সফল হওয়ার দৌড়ের কারণে কোচিং ক্লাস চালানো বর্তমানে খুবই লাভজনক ব্যবসা। শুধু সুরাটেই ২৫০টির বেশি কোচিং সেন্টার চলে। গত ছয় মাসে গুজরাটে তিনটি অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। এদিকে অনেক বাড়িতেই অগ্নিকাণ্ড রুখবার কোনও ব্যবস্থা নেই।

সাম্প্রতিক দুর্ঘটনাটি ঘটার পর সুরাটের পুর কমিশনার জানিয়েছেন, সুরাটের ২০০টি কোচিং সেন্টারে অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থা আছে কি না, তা তাঁরা পরীক্ষা করেছেন, শুধু দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাড়িটির পরীক্ষাই করা হয়নি! বাস্তবে বেআইনি নির্মাণ ও তা আইনসিদ্ধ করিয়ে নিতে ব্যাপক দুর্নীতির ব্যাপারে প্রশাসনের কর্তারা সম্পূর্ণ নীরব। এই অবস্থায় দুর্ঘটনার মৃতদের পরিবার পিছু সরকারের ৪ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ ঘোষণা বিক্ষুব্ধ মানুষের মুখ বন্ধ করার কৌশল ছাড়া কিছু নয়।

চিঠিতে আরও বলা হয়েছে, রাজ্যের ফায়ার ব্রিগেডের হালও অত্যন্ত শোচনীয়। সুরাটের সাম্প্রতিক দুর্ঘটনার সময় বোঝা গেল, ফায়ার ব্রিগেড কর্তৃপক্ষের কাছে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় শক্ত জাল যা 'সেফটি নেট' নামে পরিচিত, তা পর্যন্ত মজুত নেই। আগুন থেকে বাঁচতে উপর থেকে ঝাঁপ দিয়ে পড়া বহু ছাত্রকে লুফে নিয়ে এলাকার মানুষ অনেকগুলি প্রাণ বাঁচিয়েছেন যা প্রশংসনীয়। কিন্তু অনেককেই শুধু সেফটি নেট না থাকার কারণে দুর্ভাগ্যজনক ভাবে মরতে হল।

এই অবস্থায় চিঠিতে দাবি করা হয়েছে, অবিলম্বে বেআইনি বাড়ি তৈরি বন্ধ করতে হবে। প্রতিটি বাড়িতে অগ্নি সুরক্ষার যথাযথ ব্যবস্থা থাকা বাধ্যতামূলক করতে হবে। কোচিং সেন্টারগুলির রমরমা বন্ধের জন্য সমস্ত স্কুল-কলেজে শিক্ষাদানের মান উন্নত করতে হবে। সুরাটের অগ্নিকাণ্ডে মৃত ছাত্রদের পরিবার পিছু ২৫ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে এবং অগ্নি-সুরক্ষার দায়িত্বে থাকা অফিসারদের বিরুদ্ধে পুলিশে এফআইআর দায়ের করতে হবে।

# ভুলবেন না, আরএসএস-বিজেপির মূল শত্রু বামপন্থা

লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূলের স্লোগান ছিল ৪২-এ ৪২। অথচ প্রায় অর্ধেক আসন দখল করে নিয়েছে বিজেপি। পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির এই উত্থানের পিছনে তৃণমূল ও সিপিএম কারওর ভূমিকাই কম নয়। বর্তমানে এ রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পর থেকেই তৃণমূলের অপশাসন, ঔদ্ধত্য, লুটপাটের রাজনীতি মানুষকে বীতশ্রদ্ধ করে তুলছিল। সারদা-নারদ সহ বহু দুর্নীতিতে নিমজ্জিত নেতারা। পাশাপাশি একের পর এক নির্বাচনে, বিশেষ করে গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে হাজার হাজার বুথে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়, প্রার্থী হতে না দেওয়া, ভোট দিতে না দেওয়া, ভোট লুঠ ইত্যাদি সিপিএমের দেখানো পথেই সিপিএমের চেয়ে নগ্নভাবে চলতে থাকে। মানুষ ভেতরে ভেতরে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। এই অবস্থায় তো সিপিএমেরই যা শক্তি এবং তাতে তাদেরই তো বিপন্ন হওয়ার কথা। কিন্তু তা হল না। কারণ সিপিএমের প্রতি মানুষের কোনও আস্থা নেই, সেই শূন্যস্থান ধীরে ধীরে পূরণ করতে থাকে বিজেপি। টাকা দিয়ে, মারদাঙ্গা করে, ধর্মীয় বিদ্বেষ ছড়িয়ে বিজেপি জায়গা করে নিতে থাকে। বিজেপির হিন্দুত্বের রাজনীতি আটকাতে তৃণমূলের কোনও ইতিবাচক ভূমিকা ছিল না। সেও বিজেপির মতোই হিন্দুত্বের রাজনীতি শুরু করে। দু'দলই রামনবমীর মিছিল, হনুমান মন্দির— এসবের প্রতিযোগিতায় মেতে ওঠে। পাশাপশি মুসলিম ভোটের স্বার্থে তৃণমূল লোকদেখানো ইমাম ভাতা, মোয়াজ্জেম ভাতা চালু করে। এতে পশ্চিমবঙ্গের দরিদ্র মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রকৃতই কোনও উন্নতি হওয়ার নয়। কিন্তু এই বিষয়কে কেন্দ্র করে তৃণমূল মুসলমান তোষণের রাজনীতি করছে এই ধুয়ো তুলে হিন্দুদের উত্তেজিত করে তোলে বিজেপি। পাল্টা তৃণমূল দুর্গাপূজা কার্নিভাল থেকে শুরু করে শ্মশানের পুরোহিতদের ভাতা দেয় হিন্দু ভোটের জন্য। এভাবে ধর্মীয় বিভাজনকে হাতিয়ার করে ভোট নিয়ে লড়ালড়ি শুরু হয়। এতে রাজ্য জুড়ে বিজেপির সাম্প্রদায়িক বিষ ছড়াতে সুবিধা হয়ে যায়। যার ফলশ্রুতিতেই লোকসভার এই ফল।

অন্যদিকে সিপিএমের নীতিহীন রাজনীতিও পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির সাম্প্রদায়িক রাজনীতির জমি তৈরি করতে সাহায্য করেছে। লোকসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর পাড়ায় পাড়ায় সিপিএম কর্মীদের কোথাও চাপা, কোথাও প্রকাশ্য উচ্ছ্বাস চোখে পড়ার মতো। ভোট গণনার পরের দিন বহু অঞ্চলেই সিপিএম নেতারা ব্যঙ্গ করে বলেন, 'দিদিমণির পায়ের তলার মাটি এবার আলগা হয়ে যাচ্ছে!' হায় রে সিপিএম! হায় রে সিপিএমের বামপন্থা! নিজেরা যে কোন অতলে তলিয়ে যাচ্ছে, সে খেয়ালই নেই। তৃণমূলকে শিক্ষা দেওয়ার আনন্দেরই প্রতিচ্ছবি সিপিএম কর্মীদের চোখেমুখে! পশ্চিমবাংলায় একটা একটা সিটে বিজেপি জিতেছে আর সিপিএম কর্মীদের মন আত্মতৃপ্তিতে ভরে উঠেছে। এমনটাই তো তারা চেয়েছিল। তারা ঢেলে ভোট দিয়েছে বিজেপিকে। সংখ্যার হিসাব বলছে, বিগত লোকসভার তুলনায় প্রায় ২২ শতাংশ ভোট কমে সিপিএম দাঁড়িয়েছে ৭ শতাংশে। এখানেও ধর্মীয় মেরুকরণ কাজ করেছে। মুসলমান সিপিএম ভোট দিয়েছে টিএমসিকে। হিন্দু সিপিএম বিজেপিকে। চূড়ান্ত অবামপন্থী, সুবিধাবাদী এই ভোট রাজনীতিতে সিপিএম তত্ত্বের মোড়ক লাগিয়েছে। বিজেপির শক্তিবৃদ্ধি হলে তৃণমূল দলটা শেষ হয়ে যাবে, বিজেপির অত্যাচারে তিতিবিরক্ত মানুষ আবার সিপিএমের কাছে ফিরে আসবে। এই তত্ত্ব খাড়া করেই তারা বিজেপির শক্তিবৃদ্ধিতে সাহায্য করেছে। বামপন্থার লেশমাত্র কাণ্ডজ্ঞান থাকলে তারা বুঝত যে, আরএসএস-বিজেপির মূল শত্রু বামপন্থা।

**বিজেপি-আরএসএস সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়িয়ে সমাজকে বিষাক্ত করে তুলছে। একে যদি সত্যি সত্যিই আটকাতে হয় তবে চাই উন্নত নীতি-নৈতিকতার আধারে যথার্থ বামপন্থার চর্চা, চাই সংগ্রামী বামপন্থার ঝান্ডাকে হাতিয়ার করে তীব্র গণআন্দোলন।**

আসলে ২০১১ সালে ক্ষমতা হারানোর যন্ত্রণা আজও তাদের কুরে কুরে খাচ্ছে। যেন তেন প্রকারেণ ক্ষমতায় ফেরাটাই মুখ্য— কেন ক্ষমতা চাই, সে চিন্তা গৌণ। তাই কখনও কংগ্রেসকে আঁকড়ে ধরে সিট বাড়াবার চেষ্টা। কখনও বিজেপিকে ভোট দিয়ে তৃণমূলকে হারিয়ে ভবিষ্যতে ক্ষমতায় ফিরে আসার স্বপ্নবিলাস। এ কি বামপন্থা!

বামপন্থার পীঠস্থান এই পশ্চিমবাংলায় জনসংঘ-আরএসএস-হিন্দু মহাসভা-বিজেপি কোনও দিনই জায়গা করতে পারেনি। আজ বামপন্থী দলের কর্মী-সমর্থক থেকে নেতা-মন্ত্রীরা দলে দলে বিজেপিতে চলে যাচ্ছে! প্রশ্ন জাগে, ৩৪ বছর ক্ষমতায় থেকে ভোটচর্চা ছাড়া, মার্কসবাদের চর্চা তো ছেড়েই দিলাম, ন্যূনতম বামপন্থার চর্চা হয়েছে কি? আসলে ৩৪ বছরে 'বামপন্থা'র নাম করেই গণআন্দোলন দমন করা হয়েছে লাঠি-গুলি দিয়ে। বামপন্থার নাম করেই অবাধে রিগিং-ছাপ্পা, একের পর এক জনবিরোধী মালিকতোষণকারী সিদ্ধান্ত আর পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতি— এই তো হয়েছে! ভি পি সিং সরকারকে কেন্দ্রে বিজেপির সাথে একসাথে সমর্থন, ১৯৯০ সালে বিজেপিকে সঙ্গে নিয়ে কলকাতা কর্পোরেশনের ক্ষমতা দখল— এসব তো বামপন্থার নামেই তারা করেছে।

চিন্তাগত ক্ষেত্রে বিজেপির উগ্র সাম্প্রদায়িকতাকে আটকাতে যে যথার্থ বামপন্থার চর্চা প্রয়োজন, তা সিপিএম কোনও দিনই করেনি। তাদের লক্ষ্য ও মোক্ষ ভোটে জিতে ক্ষমতায় যাওয়া। এই সেদিনও ব্রিগেডে লোক সমাগমে উচ্ছ্বসিত সিপিএম নেতাদের মুখে কিন্তু কোনও আন্দোলনের বার্তা ছিল না। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বললেন, 'দেখবেন, এই ভিড় যেন ভোটের বাক্সে প্রতিফলিত হয়।' মানুষকে মানুষ হিসেবে দেখেন না তাঁরা, দেখেন এক একটা ভোটার হিসেবে। সিপিএমের এই ভোটসর্বস্ব নীতিহীন রাজনীতিই পশ্চিমবাংলায় বিজেপির জমি তৈরি করে দিয়েছে।

বিজেপি-আরএসএস সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়িয়ে সমাজকে বিষাক্ত করে তুলছে। একে যদি সত্যি সত্যিই আটকাতে হয় তবে চাই উন্নত নীতি-নৈতিকতার আধারে যথার্থ বামপন্থার চর্চা, চাই সংগ্রামী বামপন্থার ঝান্ডাকে হাতিয়ার করে ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকল অংশের সাধারণ মানুষকে যুক্ত করে তীব্র গণআন্দোলন। একমাত্র বিকল্প সেটাই। সিপিএমের কর্মীরা ভেবে দেখবেন!

# আজ এই দুর্দিনে স্মরণ করি তোমায় নজরুল

'মারো শালা যবনদের, মারো শালা কাফেরদের!' — আবার হিন্দু মুসলমানী কাণ্ড বাধিয়া গিয়াছে। প্রথমে কথা কাটাকাটি, তারপর মাথা ফাটাফাটি আরম্ভ হইয়া গেল। আল্লার এবং মা কালীর 'প্রেস্টিজ' রক্ষার জন্য যাহারা এতক্ষণ মাতাল হইয়া চীৎকার করিতেছিল তাহারাই যখন মার খাইয়া পড়িয়া যাইতে লাগিল, দেখিলাম— তখন আর তাহারা আল্লা মিয়া বা কালী ঠাকুরানির নাম লইতেছে না। হিন্দু-মুসলমান পাশাপাশি পড়িয়া থাকিয়া একই ভাষায় আর্তনাদ করিতেছে, —'বাবা গো, মা গো'! — মাতৃপরিত্যক্ত দু'টি ভিন্ন ধর্মের শিশু যেমন করিয়া এক স্বরে কাঁদিয়া তাহাদের মাকে ডাকে।

দেখিলাম হত-আহতদের ক্রন্দনে মসজিদ টলিল না, মন্দিরের পাষাণ দেবতা সাড়া দিল না। শুধু নির্বোধ মানুষের রক্তে তাহাদের বেদি চিরকলঙ্কিত হইয়া রহিল। ...

একস্থানে দেখিলাম ঊনপঞ্চাশ জন ভদ্র-অভদ্র হিন্দু মিলিয়া একজন শীর্ণকায় মুসলমান মজুরকে নির্মম ভাবে প্রহার করিতেছে, আর এক স্থানে দেখিলাম, প্রায় ওই সংখ্যক মুসলমান মিলিয়া একজন দুর্বল হিন্দুকে পশুর মতো মারিতেছে। দুই পশুর হাতে মার খাইতেছে দুর্বল অসহায় মানুষ। ইহারা মানুষকে মারিতেছে যেমন করিয়া বুনো জংলি বর্বরেরা শূকরকে খোঁচাইয়া মারে। উহাদের মুখের দিকে তাকাইয়া দেখিলাম, উহাদের প্রত্যেকের মুখ শয়তানের চেয়েও বীভৎস, শূকরের চেয়েও কুৎসিত! হিংসায়, কদর্যতায় উহাদের গাত্রে অনন্ত নরকের দুর্গন্ধ!

উহাদের দুই দলেরই নেতা একজন, তাহার আসল নাম শয়তান। সে নাম ভাঁড়াইয়া কখনও টুপি পরিয়া পর-দাড়ি লাগাইয়া মুসলমানদের খ্যাপাইয়া আসিতেছে, কখনও পর-টিকি বাঁধিয়া হিন্দুদের লেলাইয়া দিতেছে, সেই আবার গোরা সিপাই, গুর্খা সিপাই হইয়া হিন্দু-মুসলমানদের গুলি মারিতেছে। উহার ল্যাজ সমুদ্রপারে গিয়া ঠেকিয়াছে, উহার মুখ সমুদ্র পারের বুনো বাঁদরের মতো লাল। ...

মারামারি চলিতেছে। উহারই মধ্যে এক জীর্ণা-শীর্ণা ভিখারিনী তাহার সদ্যপ্রসূত শিশুটিকে বুকে চাপিয়া একটি পয়সা ভিক্ষা চাহিতেছে, শিশুটির তখনও নাড়ি কাটা হয় নাই। অসহায় ক্ষীণ কণ্ঠে সে যেন এই দুঃখের পৃথিবীতে আসার প্রতিবাদ করিতেছিল। ভিখারিনী বলিল, "বাছাকে আমার একটু দুধ দিতে পারছি না বাবু! এই মাত্র এসেছে বাছা আমার। আমার বুকে একফোঁটা দুধ নেই!" তাহার কণ্ঠে যেন বিশ্ব জননী কাঁদিয়া উঠিল। .... তিনদিন পরে আবার দেখিলাম, পথে দাঁড়াইয়া সেই ভিখারিনী। এবার তাহার বক্ষ শূন্য। চক্ষুও তাহার শূন্য। যেদিন শিশু ছিল তার বুকে, সেদিন চক্ষে তাহার দেখিয়াছিলাম বিশ্ব মাতার মমতা। অনন্ত নারীর করুণা সেদিন পুঞ্জিভূত হইয়া উঠিয়াছিল তাহার চোখের তারায়, তাই সে সেদিন অমন সিক্ত কাতর কণ্ঠে ভিক্ষা চাহিতেছিল। আজ তাহার মনের মা বুঝি-বা মরিয়া গিয়াছে, তাহার শিশুর সাথে। আজও সে ভিক্ষা চাহিতেছে, কিন্তু আজ সে কাতরতা নেই তাহার কণ্ঠে, আজ যেন সে চাহিবার জন্যই চাহিতেছে। .... পথের ধারে কৃষ্ণচূড়ার গাছ। তারই পাশে ডাস্টবিন। শহরের যত আবর্জনা জমা হয় ওই ডাস্টবিনে। আমি শিহরিয়া উঠিলাম। ভিখারিনী ডাস্টবিনের অনেকগুলো আবর্জনা তুলিয়া ময়লা ন্যাকড়া জড়ানো কী একটা যেন তুলিয়া লইয়া 'যাদু আমার, সোনা আমার' বলিয়া উন্মাদিনীর মতো চুমা খাইতে লাগিল। ...

চলে গেল ভিখারিনী আবার ভিক্ষা মাগতে!

ডাস্টবিন হইতে ভিখারিনীর পুত্রকে বুকে তুলিয়া লইয়া আমি চলিলাম গোরস্থানের দিকে। ...যাইতে যাইতে দেখিলাম, সেদিনের মন্দির আর মসজিদের ইট-পাথরের স্তূপ লইয়া হিন্দু-মুসলমান সমানে কাটাকাটি করিতেছে।

এমনি করিয়া যুগে যুগে ইহারা মানুষকে অবহেলা করিয়া ইট-পাথর লইয়া মাতামাতি করিয়াছে। মানুষ মারিয়া ইট-পাথর বাঁচাইয়াছে। বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া বঙ্গ-জননী তাঁহার দশ লক্ষ অনাহার জীর্ণ, রোগ শীর্ণ, অকালমৃত সন্তানের লাশ লইয়া ইহাদের পাশ দিয়া চলিয়া যাইতেছেন, ইহাদের ভ্রূক্ষেপ নাই! ইহারা মানুষের চেয়ে ইট-পাথরকে বেশি পবিত্র মনে করে, ইহারাই ইট পুজো করে। ইহারা পাথর-পুজারি!

ভূতে পাওয়ার মতো ইহাদেরে মন্দিরে পাইয়াছে, ইহাদেরে মসজিদে পাইয়াছে। ইহাদের বহু দুঃখ ভোগ করিতে হইবে।

যে দশ লক্ষ মানুষ প্রতি বৎসর মরিতেছে শুধু বাংলায়, তাহারা শুধু হিন্দু নয়, তাহারা শুধু মুসলমান নয়, তাহারা মানুষ। স্রষ্টার প্রিয় সৃষ্টি! ...

মানুষের পশু-প্রবৃত্তির সুবিধা লইয়া, ধর্মমদান্ধদের নাচাইয়া কত কাপুরুষই না আজ মহাপুরুষ হইয়া গেল! সকল কালে, সকল দেশে, সকল লাভ-লোভকে জয় করিয়াছে তরুণ। ওগো বাংলার তরুণের দল — ওগো আমার আগুন খেলার নির্ভীক ভাইরা, ওই দশ লক্ষ অকালমৃতের লাশ তোমাদের দোরে দাঁড়াইয়া! তারা প্রতিকার চায়!

তোমরা ওই শকুনির দলের নও। তোমরা আগুনের শিখা, তোমাদের জাতি নাই। তোমরা আলোর। তোমরা গানের, তোমরা কল্যাণের। তোমরা বাহিরে এস, এই দুর্দিনে তাড়াও ওই গো-ভাগাড়ে পড়া শকুনির দলকে।

(কাজী নজরুল ইসলামের 'মন্দির মসজিদ' প্রবন্ধ থেকে)

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2019-21



# ছাত্র বিক্ষোভে উত্তাল বিশ্বভারতী

গরিষ্ঠসংখ্যক জনসাধারণকে শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করার উদ্দেশ্যে গোটা দেশ জুড়ে শিক্ষার পন্যায়নের যে জোয়ার চলছে,সেই পথে হেঁটেই সম্প্রতি বিপুল ফি বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নেয় বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। ভারতবর্ষ, এসএএআরকে(সাউথ এশিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর রিজিওনাল কোঅপারেশন) ভুক্ত দেশ এবং এসএএআরকে বহির্ভূত অন্যান্য দেশের ক্ষেত্রে ফর্ম পূরণ এবং ভর্তির ফি যথাক্রমে দ্বিগুণ,পাঁচগুণ এবং দশগুণ বৃদ্ধিকরা হয়।

এই চূড়ান্ত অগণতান্ত্রিক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সরব হন বিশ্বভারতীর ছাত্রছাত্রী-গবেষকরা। বহুবার ডেপুটেশন দেওয়ার পর গত ২১ মে উপাচার্য সহ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ছাত্রদের সাথে আলোচনায় বসেন। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পরেও কর্তৃপক্ষের তরফে কোনও সিদ্ধান্ত না জানতে পেরে সুবিচারের আশায় ছাত্রছাত্রীরা রাতভর অবস্থান বিক্ষোভে সামিল হন। ছাত্রদের ন্যায়সঙ্গত দাবি বিবেচনার পরিবর্তে পরের দিন,২২ মে সকালে রেজিস্ট্রার সহ কিছু শিক্ষক আন্দোলনরত ছাত্রছাত্রীদের ওপর চড়াও হন, এমনকি প্রতিবাদী ছাত্রীদেরও শারীরিক হেনস্থার শিকার হতে হয়। অধ্যাপক তথাগত চৌধুরী সহ কয়েকজন শিক্ষক অশ্লীল ভাষায় ছাত্রদের আক্রমণ করেন, ‘এই আন্দোলনে বাংলাদেশের ছাত্রদের থাকা অনুচিত এবং এর পিছনে বাংলাদেশের অবৈধ আর্থিক মদত আছে’ — এহেন সাম্প্রদায়িক উস্কানিমূলক মন্তব্য করতেও শোনা যায় তাদের।

রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিবিজড়িত একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সর্বস্তরের মেধাবী ছাত্রদের জন্য উচ্চশিক্ষার পথ সুগম করে তোলাই যার লক্ষ্য হওয়া উচিত ছিল, সেখানে এই ধরণের ছাত্রস্বার্থবিরোধী পদক্ষেপ কোনওভাবেই মেনে নেবে না গণতন্ত্রপ্রিয় সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা। ‘বিশ্বভারতী ছাত্রছাত্রী ঐক্য’ সংগঠনের পক্ষ থেকে কর্তৃপক্ষের এই অশিক্ষকসুলভ নিন্দনীয় আচরণ এবং ছাত্র ঐক্যে ফাটল ধরানোর অপচেষ্টাকে তীব্র ধিক্কার জানানো হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠনপাঠনের পরিবেশ রক্ষার স্বার্থে দ্রুত বর্ধিত ফি প্রত্যাহার এবং দোষী শিক্ষকদের শাস্তির দাবিও জানান তাঁরা।

# মিড ডে মিল চালু রাখার দাবি

সারা বাংলা মিড ডে মিল কর্মী ইউনিয়নের হাওড়া জেলা কমিটির পক্ষ থেকে ২০ মে জেলার মিড ডে মিল কর্মীরা জেলা শাসককে স্মরকলিপি দিয়ে দু’মাস বিদ্যালয় বন্ধ থাকার সরকারি ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে গরিব ছাত্রছাত্রীদের জন্য মিড ডে মিল চালু রাখার দাবি জানান। সাথে সাথে মিড ডে মিল কর্মীদের মাসিক বেতন যাতে বন্ধ না করা হয় তারও দাবি জানান।

তাঁরা উলুবেড়িয়াতে বিডিও-র কাছেও স্মারকলিপি দিয়ে তাঁদের দাবি জানান।

# গণআন্দোলন গড়ে তোলার ডাক

*একের পাতার পর*

মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারায় পরিচালিত আমাদের দল বরাবর বলে আসছে, চরম সাম্প্রদায়িক ফ্যাসিস্ট রাজনীতিকে এবং আরএসএস-বিজেপির আক্রমণকে প্রতিহত করার জন্য যে জরুরি কাজটি করা দরকার, তা হল জনগণের জীবনের জ্বলন্ত সমস্যাগুলিকে নিয়ে দীর্ঘস্থায়ী শক্তিশালী ঐক্যবদ্ধ বাম-গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তোলা। আমরা আরও বলেছি, এই ঐক্যবদ্ধ গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পরিবেশ এমন একটা সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল সৃষ্টি করবে যা ধর্মের ভিত্তিতে ও অন্যান্য নীচ উপায়ে জনগণকে বিভক্ত করার আরএসএস-বিজেপির ষড়যন্ত্রকে বিফল করে দিতে পারে।

দেশের মধ্যে বাস্তবেও একটার পর একটা স্বতঃস্ফূর্ত কৃষক বিক্ষোভ, শ্রমিক, নারী ও ছাত্রদের বিক্ষোভ চলছিলই, যা সংগঠিত বাম-গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তোলার সুযোগ দিয়েছিল। আমরা সিপিআই(এম), সিপিআই ও তাদের সহযোগী দলগুলিকে বার বার এই মর্মে আহ্বান জানিয়েছি, তারা যাতে বুর্জোয়া সংসদীয় রাজনীতিতে আটকে থাকার লাইন পরিত্যাগ করে এই ধরনের ঐক্যবদ্ধ গণসংগ্রাম গড়ে তুলতে এগিয়ে আসে। কিন্তু তারা আমাদের কথায় কর্ণপাত করেনি। সিপিআই(এম) এবং সিপিআই আমাদের আবেদনে কোনও সাড়া দেয়নি এবং পরিবর্তে পার্লামেন্টে কিছু সিট পাওয়ার জন্য বুর্জোয়া বিরোধী দলগুলিকে তো বটেই এমনকী কোথাও কোথাও সংকীর্ণতাবাদী আঞ্চলিক বুর্জোয়া দলগুলিকেও ‘সেকুলার’ ও ‘গণতান্ত্রিক’ তকমা দিয়ে তাদের সাথে নানা ধরনের নীতিহীন সুবিধাবাদী আঁতাত ও বোঝাপড়ায় যোগ দিয়েছে। এর ফলেই শাসক বুর্জোয়া শ্রেণি তার সবচেয়ে বিশ্বস্ত রাজনৈতিক ম্যানেজার বিজেপিকে আবার কেন্দ্রীয় সরকারের গদিতে বসাতে সফল হয়েছে। লক্ষনীয় হল, এই পরিস্থিতিতে সমস্ত প্রতিকূলতা এবং বিপদের মোকাবিলা করে আমাদের দল নির্বাচনী সংগ্রামে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা এবং সংগ্রামী বামপন্থার ঝান্ডাকে তুলে ধরেছে। সমস্ত শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ আমাদের এই ভূমিকাকে সাধুবাদ জানিয়েছেন।

জনস্বার্থের নিরিখে এই নির্বাচনী ফল বিপর্যয়কর হলেও এতে মনোবল হারাবার কিছু নেই। সংসদীয় নির্বাচনের এই ফলাফলের সামনে মানুষের কর্তব্য হচ্ছে, পরিস্থিতিকে বুঝে উঠে দাঁড়ানো এবং শোষক শ্রেণি এবং বিজেপি সরকারের প্রতিটি ভয়ঙ্কর নির্মম আক্রমণকে প্রতিহত করার শপথ নেওয়া। আরএসএস-বিজেপির এই চূড়ান্ত জনবিরোধী সাম্প্রদায়িক ফ্যাসিবাদী কার্যকলাপ প্রতিহত করা সম্ভব শক্তিশালী শ্রেণিসংগ্রাম ও গণসংগ্রামের ঢেউ তুলে যাকে অবশ্যই সংগ্রামী বামপন্থার মূল রাজনৈতিক লাইনের ভিত্তিতে এবং উন্নত নীতি-নৈতিকতা ও সংস্কৃতির আধারে। দেশের জনসাধারণ এবং বামপন্থী দলগুলির সৎ, বিবেকবান কর্মীদের কাছে আমাদের আন্তরিক আবেদন, জনজীবনের ন্যায়সঙ্গত দাবি নিয়ে দেশ জুড়ে একটার পর একটা গণআন্দোলনের ঢেউ তুলতে আমাদের এই উদ্যোগে সামিল হোন।

সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ প্রতিষ্ঠিত এবং তাঁর চিন্তায় পরিচালিত আমাদের দল এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) শক্তিশালী শ্রেণিসংগ্রাম এবং গণসংগ্রাম গড়ে তোলার জন্য বরাবরের মতো এখনও দায়বদ্ধ।

# আইনজীবীদের আন্দোলনের সমর্থনে নাগরিক কনভেনশন

২৪ এপ্রিল হাওড়া কোর্টের ভিতরে পুলিশ ও র‍্যাফ বাহিনী আইনজীবী, ল-ক্লার্ক এবং সাধারণ মানুষের উপর যে নজিরবিহীন আক্রমণ নামিয়ে এনেছিল, লাঠিচার্জ এবং টিয়ার গ্যাসের সেল ফাটিয়েছিল, তা দেখে সাধারণ মানুষ ও আইনজগৎ স্তম্ভিত। ঘটনার পরদিনই পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সমস্ত আদালতের বার অ্যাসোসিয়েশন ঘটনার প্রতিবাদে কর্ম বিরতির ডাক দেয়। পশ্চিমবঙ্গের বার কাউন্সিলও এই ঘটনার প্রতিবাদে কর্ম বিরতির ডাক দেয় এবং ওই দিনই কলকাতা হাইকোর্টের মাননীয় প্রধান বিচারপতিও স্বতঃপ্রণোদিত মামলা রুজু করেন। লিগ্যাল সার্ভিস সেন্টার শুরু থেকেই এই আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে এবং হাওড়া সহ কলকাতায় যে ক’টি মিছিল এবং রাজ্যপালের কাছে ডেপুটেশন কর্মসূচি হয় তাতে সক্রিয়ভাবে যোগ দেয়।

১৫ মে লিগ্যাল সার্ভিস সেন্টার এবং সিপিডিআরএস বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে হাওড়া আইএমএ হলে একটি নাগরিক কনভেনশনের ডাক দেয়। উক্ত কনভেনশনে হাওড়া কোর্ট সহ পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সব কোর্ট থেকেই আইনজীবী, ল-ক্লার্ক এবং আইনের ছাত্রছাত্রীরা অংশগ্রহণ করেন। কনভেনশনের প্রথমেই ১৪ মে কলকাতার বিদ্যাসাগর কলেজে নবজাগরণের পথিকৃৎ বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙার ঘটনায় ধিক্কার জানিয়ে প্রস্তাব পাঠ করেন অধ্যাপিকা সুচন্দ্রা চৌধুরী এবং বিদ্যাসাগরের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করা হয়।

বহু আইনজীবী সহ লিগ্যাল সার্ভিস সেন্টারের সম্পাদক প্রবীণ আইনজীবী ভবেশ গাঙ্গুলী (হাইকোর্ট), বিজয়শঙ্কর অগ্রহরী (হাওড়া কোর্ট), উদয় ঘোষ (হাওড়া কোর্ট), কার্তিক রায় (হাইকোর্ট), প্রতীম পন্না/প্রীতম পণ্ডা (আলিপুর কোর্ট), সমীর রায় (পশ্চিম মেদিনীপুর কোর্ট), পদ্মলোচন সাউ (হাওড়া কোর্ট), চিন্ময় ভৌমিক (পূর্ব মেদিনীপুর কোর্ট) এবং সিপিডিআরএস-এর রাজ্য সম্পাদক অধ্যাপক গৌরাঙ্গ দেবনাথ প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। সমাপ্তি ভাষণে কনভেনশনের সভাপতি আইনজীবী তনয়া মিত্র কনভেনশনের মূল প্রস্তাবকে সম্পূর্ণ সমর্থন করে বক্তব্য রাখেন এবং পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত আইনজীবীদের নেতৃত্বে যে ঐতিহাসিক আন্দোলন চলছে তার পাশে সক্রিয়ভাবে থাকার অঙ্গীকার করেন।

*নবজাগরণের পথিকৃৎ বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙার প্রতিবাদে ত্রিপুরার আগরতলায় অল ইন্ডিয়া ডি এস ও, অল ইন্ডিয়া ডি ওয়াই ও, অল ইন্ডিয়া এম এস এস-এর প্রতিবাদ সভা। ১৮ মে*

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com